সম্বোধি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা : গ্রন্থাঙ্ক দুই

সাধারণ সম্পাদক : কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

রামকমল সেন

প্যারীচাঁদ মিত্র

অনুবাদ

সুশীলকুমার গুপ্ত

সম্পাদনা

যোগেশচন্দ্র বাগল

সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড
বাইশ স্ট্র্যান্ড রোড। কলিকাতা এক

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬৪

প্রকাশক
রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বা ই শ স্ট্র্যাণ্ড রোড
কলিকাতা এ ক

মুদ্রক
সুনীল রায়
অভ্যুদয়
তি রি শ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ন য়

প্রচ্ছদশিল্পী
ধ্রুব রায়

রামকমল সেন

ভূমিকা

পুণ্যশ্লোক রামকমল সেন একজন প্রতিভাবান কর্মকুশল ব্যক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সমস্ত শিক্ষা- সাহিত্য- সংস্কৃতি- মূলক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আয়োজিত হয়, তার সঙ্গে রামকমলের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধিত হয়েছিল। তাঁর প্রতিভা ও কর্মনৈপুণ্য এই সকল উদ্যোগের মধ্যে নিয়োজিত হয়। কোন কোনটির সঙ্গে বৈতনিক কর্মীরূপে সংযুক্ত হলেও পরে এর সম্মানিত সদস্য-পদ অলংকৃত করেন এবং কর্ম-কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত হন। বিভিন্ন উদ্যোগ ও সভাসমিতির মুদ্রিত অমুদ্রিত কার্য-বিবরণ সমসাময়িক পত্রপত্রিকা এবং সরকারী দলিলদস্তাবেজ থেকে এ বিষয়ে আমরা বিস্তর তথ্য আহরণ করতে পারি। বস্তুত গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা গবেষণায় যে- নূতন পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে তাতে ঐ সকল আকর থেকে বিস্তর প্রামাণিক তথ্য পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়েছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও রামকমল সেন সম্বন্ধে বাংলাভাষীর জ্ঞান ছিল নিতান্ত ভাসা ভাসা। প্যারীচাঁদের রচনা ইংরেজীতে লেখা, বাংলা-ভাষীর নিকট এর বিষয়বস্তু প্রায়ই ছিল অজ্ঞাত। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একটি সামাজিক ইতিহাস প্রদানের প্রয়াস পান। তাঁর এই বিখ্যাত পুস্তকখানিতে রামকমল সেন সম্বন্ধে কয়েক পঙক্তির একটি অনুচ্ছেদ মাত্র আছে। রাজা রাধাকান্ত দেব সম্পর্কীয় আলোচনাও প্রায় অনুরূপ স্থান পেয়েছে। রামকমল সেন সম্পর্কিত ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ এই সামান্য অনুচ্ছেদটি থেকে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণাই করা যায় না।

অবশ্য রামকমলের পৌত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কখন কখন তাঁরাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর দ্বারাও কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে না। কেশবচন্দ্রের ছোট-বড় ইংরেজী-বাংলা বহু জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাতে পিতামহ রামকমল সম্বন্ধে স্বভাবতঃই কিছু কিছু উল্লেখ রয়েছে। এ সবের দ্বারাও কিন্তু পূর্ণ মানুষটির সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে না। কেশব-জননী সারদাসুন্দরী দেবীর 'আত্মকথা' থেকে সেন-পরিবারের আভ্যন্তরীণ কাহিনী আমাদের পক্ষে কতকটা জানা সম্ভব। এর ভেতর থেকে মানুষ রামকমল সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু তথ্য আহরণ করতে পারি। রামকমল কর্মবীর এবং ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হলেও ছিলেন নিতান্তই সাদাসিধে। বহু কাজের মধ্যেও ধর্মপ্রাণ রামকমল নিয়মিত আহ্নিক জপ-তপ করতে ভুলতেন না। প্রতিদিন স্বপাকে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতেন। অমন নিয়মনিষ্ঠ মানুষ দু'টি মেলা ভার। পরিবারের প্রতিটি নরনারীর প্রতি ছিল তাঁর সমান ব্যবহার। নাতি-নাতনীরা আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হতো। সারদাসুন্দরীর গ্রন্থপাঠে আমরা রামকমলের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে যে সব কথা পাই, অন্য কোথাও তা পাই না, পাওয়া হয়তো সম্ভবও নয়। বাংলা ভাষা মারফত তাই আমাদের জ্ঞানপিপাসা মেটাবার উপায় ছিল নিতান্তই সামান্য।

হয়তো এর একটি কারণ রয়েছে। রামকমল সেন ছিলেন রক্ষণশীল তথাকথিত সংস্কারপ্রিয়। প্রগতিভাবাপন্ন লেখকগণ রামকমলের সুকৃতির যথাযথ মূল্যায়ন করতে অসমর্থ ছিলেন। তবে এজন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস রচনার যে সব মালমশলা আমাদের এখন সহজলভ্য, তার ভিত্তিতে সে যুগের একটি পরিষ্কার রূপ প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ভারতের নবযুগের প্রবর্তক বলে রাজা রামমোহন রায়ের প্রসিদ্ধি। ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, আন্দোলন এবং খ্রীস্টান পাদ্রীদের অপপ্রচার, সংবাদপত্রের

স্বাধীনতা বিলোপ প্রভৃতির প্রতিবাদে সমাজে ও সরকারে যে আলোড়ন উপস্থিত হয় তার মধ্যে এই নবযুগের সূচনা লক্ষ করি। এর ফলে বাংলার সাহিত্যে সংস্কৃতিতেও নবজীবন সঞ্চারিত হয়। রামমোহন একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে গিয়ে রক্ষণশীল সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যে সংস্কার ও উন্নতি অর্থাৎ কল্যাণমূলক প্রয়াসে ব্রতী হন এই একই কারণে তা হয়ত সমাজমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবার সুযোগ পেত না, যদি না সমাজের তথা-কথিত এবং পরবর্তীকালে উপেক্ষিত রক্ষণশীল নেতৃবর্গ এতে আন্তরিক-ভাবে সহায়তা করতেন। বাস্তবপক্ষে বাংলা তথা ভারতের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ভিত্তি রচনায় একদিকে যেমন সংস্কারপন্থী রামমোহন ও তদনুবর্তী দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি, অন্যদিকে তেমনি রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন রক্ষণশীল ব্যক্তিগণের কৃতিত্ব আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। সংস্কার ও সংরক্ষণের মধ্যেই রেনেসাঁসের পরিপূর্ণ সার্থকতা। ফলত, সমাজকল্যাণকর বিবিধ উদ্যোগের সঙ্গে সংস্কারপন্থীদের মতো রক্ষণশীল নেতৃবর্গকেও সমভাবে যুক্ত দেখা যায়। বরং কোন কোনটি—যেমন, হিন্দুকলেজ থেকে সংস্কারপন্থীরা পূর্বে নিজেদের দূরেই রেখে চলেছিলেন।

যে- সকল উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্য দিয়ে রেনেসাঁস জাতির চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করে তার মধ্যে হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি, গৌড়ীয় সমাজ প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্য-সংস্কৃতি-মূলক প্রতিষ্ঠানের কথা আগেই মনে পড়ে। রামমোহন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রাক্‌কালে প্রচলিত শিক্ষার ব্যর্থতা এবং রসায়নশাস্ত্র পদার্থবিদ্যা শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে তৎকালীন বড়লাটকে একখানি পত্র লেখেন। এই পত্র আধুনিক যুগের শিক্ষা সংস্কারের 'ম্যাগনাকার্টা' বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ দেখি রক্ষণ-

শীল নেতৃবর্গ সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা না করেও বরং আগে থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বনে তৎপর হয়েছিলেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষগণ ছাত্রদের আধুনিক বিজ্ঞান শেখাবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন আর তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হন। এরও চার বৎসর আগে ১৮১৯ সনে রামকমল সেন 'ঔষধসার সংগ্রহ' প্রকাশ করেন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রচিত ইংরেজী প্রামাণিক ফার্মাকোপিয়া গ্রন্থ থেকে অনুবাদ ক'রে। তিনি আয়ুর্বিজ্ঞানের সংস্কার এবং পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রবর্তন ও প্রসার মানসে ১৮৩১ সনে বৈদ্যক-সমাজে এক সারগর্ভ ভাষণ দেন। তাঁর পাশ্চাত্ত্য-চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি আকৃতি দেখেই মনে হয় বড়লাট বেন্টিঙ্ক তৎকালীন চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার অবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নতিকল্পে বিচার-বিবেচনার নিমিত্ত যে- কমিটি গঠন করেন তাতে ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র রামকমলেরই স্থান হয়েছিল। কমিটির অপর চারজন সদস্য ছিলেন সকলেই ইউরোপীয়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে বড়লাট মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের আয়োজন করলেন। আর তাতে শেখাবার ব্যবস্থা হলো চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক ও সহায়ক বিবিধ বিদ্যা, যেমন রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, শারীর, সংস্থানবিদ্যা শল্যবিদ্যা, ভেষজতত্ত্ব প্রভৃতি। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ এইরূপে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষারও কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। রামকমল আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে এতকাল যে স্বার্থ-চিন্তা করেছেন, হিন্দু কলেজের শিক্ষায় যা অংশত অনুসৃত হয়েছে, মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে তার পরিপূর্ণতা দেখে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন এবং দেখি আমৃত্যু তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যোগরক্ষা করে চলেছেন।

শিক্ষা- সাহিত্য- সংস্কৃতি- মূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামকমলের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয় এবং এর প্রত্যেকটির ক্রমোন্নতিতে স্বকীয় চিন্তা সময় ও শক্তি নিয়োজিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক

সোসাইটি, স্কুল সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি, এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি ও সংস্কৃত কলেজের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্যে ১৮২৩ সনে স্থাপিত প্রথম সভা গৌড়ীয় সমাজের তিনি ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোক্তা ও অন্যতর সম্পাদক, দ্বিতীয় সম্পাদক ছিলেন রামমোহনপন্থী প্রগতিশীল যুবক প্রসন্নকুমার ঠাকুর। লক্ষণীয় যে, রামমোহনের জীবিত কালেই জাতির গঠনমূলক কার্যে রক্ষণশীল-প্রধান রামকমলের রামমোহনপন্থীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে আপত্তি হয়নি। রামমোহনের মৃত্যুর পরও সমাজ-কল্যাণকর বিবিধ প্রচেষ্টায় রক্ষণশীল ও প্রগতিপন্থী মিলিতভাবে কাজ করতে থাকেন। ফিভার হসপিটাল কমিটি ও ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর একটি কথাও কিন্তু এখানে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রধানেরা বহুক্ষেত্রে সমাজহিতের নিমিত্ত একযোগে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হতেন। রামমোহনের বিলাতযাত্রার পূর্বে বরং দেখি, রক্ষণশীল হিন্দু নেতারাই সদাশয় ইংরেজদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে অগ্রসর হয়েছেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন, উইলিয়ম কেরী, ডেভিড হেয়ারের নাম তো চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে রামকমলের আন্তরিক যোগাযোগের কথা আজ কে না জানেন।

কলকাতার ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি বা জমিদার-সভা প্রতিষ্ঠাতেও ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রধানেরা উদ্যোগী হন। কিন্তু এরূপ একটি সভা স্থাপনের প্রয়োজনীতার বিষয়, অথবা আধুনিক ভাষায় পরিকল্পনা, যে রামকমল সেনের তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তৎকালীন জাতীয় সমস্যাদি সমাধানের নিমিত্ত বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স বা বণিকসভার মতো একটি নিয়মানুগ রাজনৈতিক সভা স্থাপনের প্রস্তাব তিনি প্রথম উত্থাপন করেন। আর এই প্রস্তাবের অনুক্রমস্বরূপ প্রাথমিক আলাপ আলোচনা ও সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের পর ১৮৩৮ সনে জমিদার-সভা

স্থাপিত হলো। বলা বাহুল্য, রামকমল এর অধ্যক্ষসভায় স্থান পেলেন। রক্ষণশীল নেতৃবর্গ ডিরোজিও-শিক্ষায় অনুপ্রাণিত নব্যবঙ্গের উপর ভীষণ উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য কুপিত হন এবং সেজন্য তাঁদের উপর যথেষ্ট নিন্দাও বর্ষণ করেন। কিন্তু নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ যখনই শিক্ষা-সংস্কৃতি-ও-জাতিগঠন-মূলক কার্যে অগ্রসর হয়েছেন তখন এই রক্ষণশীল নেতারা তাঁদের সাহায্য করতে পশ্চাদ্‌পদ হননি। উদাহরণস্বরূপ রামকমল তাঁদের 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র স্থান করে দেন সংস্কৃত কলেজ ভবনে। তখন তিনি এই কলেজের সম্পাদক। খ্রীস্টানি উপদ্রব এবং সরকারের প্রতিকূল বিধি-ব্যবস্থা যখন চরমে উঠতে থাকে তখনও রক্ষণশীল-প্রধানেরা প্রগতিশীল যুবক-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলে এর প্রতিরোধে অগ্রসর হন। সেই তথাকথিত রক্ষণশীলদেরই অন্যতম সার্থক প্রতিনিধি রামকমল অবশ্য তার আগেই লোকান্তরিত হয়েছিলেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

প্যারীচাঁদ মিত্রের রামকমল সেন শীর্ষক স্বল্পপরিসর ইংরেজী জীবনী-গ্রন্থ রামকমল সেনের জীবন ও কর্মপ্রতিভা সম্পর্কিত একটি অমূল্য আকরগ্রন্থ। এর মধ্যে রামকমলের জীবন ও কর্মের নানা সূত্র বিধৃত। 'সম্বোধি' প্রকাশালয় কর্তৃপক্ষ এই আকর গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশে বাঙালীজাতি তথা বাংলাভাষী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই সুযোগে আমরা কিছু পিতৃঋণ স্বীকারে সমর্থ হলাম।

ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে আমি যখন গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-মূলক বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণায় লিপ্ত হই তদবধি রামকমল সেনের অনলস নীরব সাধনার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত ইংরেজী জীবনীগ্রন্থের ভিত্তিতে অনুসন্ধান সুরু করে আনুষঙ্গিক বিস্তর নূতন ও স্বল্পজ্ঞাত তথ্য আমার হস্তগত হয় এবং 'অর্চনা' মাসিক পত্রে একটি প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে এগুলি সন্নিবেশিত করি। এবং তা পরে কিঞ্চিৎ বিশদ করে 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় অন্য একজন সাহিত্য-সাধকের সঙ্গে পুস্তকাকারে প্রকাশ করি। বর্তমানে এই গ্রন্থ সম্পাদনে রামকমলের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে আমি 'সম্বোধি'র কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

গ্রন্থ সম্পাদনাকালে আমি শ্রীযুক্ত গৌতম সেন, শ্রীমান কানাইলাল দত্ত, শ্রীমান ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য এবং অধ্যাপক কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। গ্রন্থের নির্ঘণ্ট রচনা করেছেন শ্রীমান দীপক সেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থ-মধ্যে সামান্য কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ও বানানের অসঙ্গতি থেকে গেছে। এজন্য পাঠকের মার্জনাপ্রার্থী।

লেখক প্রসঙ্গে

গত শতাব্দীতে বাংলার নব রূপায়নে যে সব মনীষী আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র অন্যতম। প্যারীচাঁদ কলকাতা নিমতলা ঘাট স্ট্রীটস্থ মিত্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (২২ জুলাই, ১৮১৪)। পিতা রামনারায়ণ মিত্র পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ প্যারীচাঁদ ও কনিষ্ঠ কিশোরীচাঁদ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হিন্দু কলেজে আট বৎসর (১৮২৭-৩৫) অধ্যয়ন করার পর প্যারীচাঁদ কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সাব-লাইব্রেরিয়ান বা সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন (৮ মার্চ, ১৮৩৬)। স্বীয় কর্মগুণে তিনি ১৮৪৯ সন নাগাদ স্থায়ী গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হন। ১৮৬৬ সনে তিনি এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই লাইব্রেরিটি প্যারীচাঁদের অনলস প্রযত্নে একটি বিখ্যাত বিদ্যা-কেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্যারীচাঁদ বিশ্বাস করতেন অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হলে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সুদূরপরাহত। তাই তিনি প্রথমে অপরের সহযোগে এবং পরে নিজেই 'প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্স' নামে একটি বাণিজ্যকুঠি খোলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নব্যদলের নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তীও তাঁর সঙ্গে এক যোগে ব্যবসায় কর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। গ্রন্থাগারিকের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পরও বহু বৎসর তিনি ব্যবসায় পরিচালনা করেছিলেন।

শিক্ষা- সাহিত্য- সংস্কৃতি- ও- সমাজকল্যাণ- মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে প্যারীচাঁদের যোগ ছিল অতি নিবিড়। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। প্রসিদ্ধ বিতর্ক সভা—'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর

সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে তিনি যে যুক্ত ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। এই সময়কার ছাত্র-নেতারা কয়েক বৎসর পরে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা-সভা' প্রতিষ্ঠা করেন (মার্চ, ১৮৩৮)। সভার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় প্যারীচাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি এখানে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। নিখিল ভারতীয় আদর্শ নিয়ে ১৮৪৩ সালের ২০ এপ্রিল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (ভূদেববাবুর ভাষায় 'ভারতবর্ষীয় সভা') কলকাতায় সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। এই সভার কাজে প্যারীচাঁদ সক্রিয় ভাবে যোগ দেন। সে যুগের সমাজকল্যাণমূলক দু'টি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও প্যারীচাঁদ একান্তভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। একটি হলো 'ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি', অপরটি 'এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি' বা সংক্ষেপে কৃষিসমাজ।

পরবর্তী দুই দশকে (১৮৫১-৭১) রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে প্যারীচাঁদ প্রতিষ্ঠাবধি যুক্ত হন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (যা 'ভারতবর্ষীয় সভা' নামে আখ্যাত হয়) প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮৫১, ২৯ অক্টোবর। মুখ্যতঃ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির উদ্দেশ্য নিয়ে এই সভার আবির্ভাব। প্যারীচাঁদ প্রথমাবধিই এর সঙ্গে যুক্ত হন। 'বেথুন সোসাইটি' স্থাপিত হয় ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৫১ তারিখে। এটি আদতে একটি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি- মূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সমাজের উন্নতিকল্পে বিবিধ বিষয়ে লেখা প্রবন্ধাদি পড়ার ব্যবস্থা হয় এখানে। প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার প্রথম সম্পাদক।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতিকল্পে ১৮৫০ সনের শেষে 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' নামে আর একটি সভার উৎপত্তি হয়। স্বল্প-শিক্ষিতের জন্য পাঠ্যাতিরিক্ত বাংলা পুস্তক সরল ভাষায় অনুবাদ ও মূল গ্রন্থ রচনার ব্যবস্থা করা ছিল এই সভার প্রধান কাজ।

পরবর্তী দশকে কলিকাতা 'স্কুল বুক সোসাইটি'র অঙ্গীভূত হয়ে এই সমাজ স্বীয় কার্য সম্পাদন করতে থাকে। প্যারীচাঁদ এই উভয় সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটির সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থেকে নারীপাঠ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ প্রকাশে তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ (১৮৬৭)। এর অর্থনীতি ও বাণিজ্যবিভাগের কার্য সম্পাদনেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। পশু-ক্লেশ নিবারণী সভার (Society for the Prevention of Cruelty to Animals—সংক্ষেপে C. S. P. C. A.) সঙ্গে প্রথমাবধি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি।

পত্নীবিয়োগের পর ১৮৬০ সাল থেকে প্যারীচাঁদ অধ্যাত্মবিদ্যার (Theosopy) চর্চায় আকৃষ্ট হন। বস্তুত এদেশে অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চায় প্যারীচাঁদ পথ-প্রদর্শক। মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি এবং কর্নেল অলকটের সহযোগিতায় প্যারীচাঁদ ১৮৮২ সনে বঙ্গীয় থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন স্বায়তই প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি কলকাতা পৌরসভার জাষ্টিস্ অব দি পীস্, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো রূপে সমাজের বিবিধ হিতকর্মে ব্যাপৃত হন।

প্যারীচাঁদের সাহিত্য-সাধনা সর্বজনবিদিত। ছাত্রাবস্থা থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন সভা সমিতিতে প্যারীচাঁদ স্বরচিত ইংরেজী বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করতেন এবং নানা পত্র পত্রিকায় সে সকল সাদরে স্থান পেত। রাধানাথ সিকদারের সহযোগে তৎকর্তৃক স্ত্রী-পাঠ্য সহজবোধ্য 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদন ও প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে এক নব যুগের সূত্রপাত করে। এই পত্রিকাতেই টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ক্রমশ প্রকাশিত হয়। এখানি পুস্তকাকারে গ্রথিত হয় ১৮৫৮

সনে। প্যারীচাঁদ তৎকালীন সমাজে হিতকর এবং স্ত্রীলোকদের পাঠোপযোগী আরও বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কিন্তু তাঁর এই 'আলালের ঘরের দুলাল'-ই সে সময় বাংলা সাহিত্যে দিক্‌স্তম্ভের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই গ্রন্থকে বঙ্কিমচন্দ্র 'আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি' বলে অভিনন্দিত করেছেন।

ইংরেজী সাহিত্যের অনুশীলনেও প্যারীচাঁদ সমান তৎপর ছিলেন আজীবন। তাঁর পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব-রূপায়নে তথা নবজাগরণের ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য। প্যারীচাঁদের বিস্তর প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে 'ইণ্ডিয়া রিভিউ', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (প্রথমে মাসিক, মধ্যে পাক্ষিক ও পরে সাপ্তাহিক), 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'থিওসফিস্ট,' 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন', 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী গ্রন্থও কম নয়। তার মধ্যে A Biographical Sketch of David Hare (1877), Life of Dewan Ramcomul Sen (1880), এবং Life of Colesworthy Grant (1881) বাংলার তথা বাঙালীসমাজের নবরূপায়নের উপরে বিশেষ আলোকপাত করে।

২৩শে নভেম্বর ১৮৮৩ কর্মবীর সাহিত্যসাধক প্যারীচাঁদের জীবনাবসান ঘটে।

প্যারীচাঁদের জীবন ও কর্মের প্রামাণিক তথ্যাদির জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যারীচাঁদ মিত্র' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের 'বাঙলার নব্য সংস্কৃতি' (বিশ্বভারতী)। এ ছাড়া শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের 'জাতীয় গ্রন্থাগার'—(প্রবাসী—ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৫৭, ও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮) 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' (প্রবাসী—শ্রাবণ, চৈত্র এবং বৈশাখ ১৩৬২) ও 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা' (প্রবাসী—কার্তিক, পৌষ, চৈত্র ১৩৬২) দেখা যেতে পারে।

সাধারণ সম্পাদকের নিবেদন

নানাভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়রূপে পরিগণ্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনস্বীজনের চিন্তায়, ধ্যাননে, কর্মে-কৃতিত্বে উজ্জ্বল এই শতাব্দী। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে কোন একসময়ে একসঙ্গে এত মনীষী বা কর্মসাধক কখনো আবির্ভূত হননি। একটু অন্যভাবে, হয়তো প্রাদেশিকভাবেই, গত শতাব্দীকে ভারতবৃত্তে 'বাংলার যুগ' বলে অভিহিত করতে পারি।

ব্যক্তিত্বের বিচারে রামমোহন বিদ্যাসাগরের সমুচ্চতার অধিকারী না হলেও এমন আরও কয়েকজন ঊনবিংশ শতাব্দীকে তাঁদের কর্মকাণ্ডে বিধৃত করে রেখে গেছেন, যাঁরা আজ প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালবর্তী। অথচ যে-কোন যুগের মূল্যায়নে এই ধরনের অনতি-উচ্চ ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্মকৃতির সামগ্রিক আলোচনা অবশ্যকরণীয়। বিগত বাংলার ইতিহাসে এমন কিছু সার্থক ব্যক্তির সাক্ষাৎ মেলে। রামকমল সেন তাঁদেরই একজন।

সেকালের অন্য অনেকের মতো রামকমল সেনও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন সুরু করেন। বছর-দুই নামি এবং ব্লেকিণ্ডেনের অধীনে কাজ করার পর তিনি ডক্টর হাণ্টারের 'হিন্দুস্থানী প্রেস'-এ মাসিক আট টাকা মাইনের কম্পোজিটরের কাজ নেন। তারপর নানা অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে তিনি 'বেঙ্গল ব্যাঙ্ক'-এর দেওয়ান হন। ব্যক্তিগত কর্মজীবন ছাড়া ব্যাপক গণজীবনেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত-কলেজ, মেডিকেল কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি,

এগ্রি-হর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটি—সেকালের প্রায় সমস্ত বিদ্বৎসমাজ বা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামকমল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। কলকাতার জনস্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর মনোযোগও এ সূত্রে স্মরণীয়।

কর্মী-রামকমলের সঙ্গেই মনে পড়ে লেখক-রামকমলকে। 'নীতি-কথা', 'হিতোপদেশ' বা 'ঔষধসার সংগ্রহ'-এর মতো প্রয়োজনীয় রচনাতে লেখক-রামকমলের অসম্পূর্ণ পরিচয়। লেখক-রামকমল স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর স্তম্ভপ্রতিম 'ইংরেজী-বাংলা অভিধান' গ্রন্থে—'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া'র যশস্বী সম্পাদক মার্শম্যান যে-গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলে-ছিলেন : 'এই ধরনের যত বই আমাদের আছে, তাদের মধ্যে এটি বেশী সম্পূর্ণ ও মূল্যবান।·· ···সম্ভবতঃ এই কাজের জন্যেই তাঁর (অর্থাৎ রামকমলের) নাম ভবিষ্যৎবংশীয়দের কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক স্বীকৃতি লাভ করবে' (পৃঃ ৫১)।

রামকমল তাঁর ভবিষ্যৎবংশীয়দের কাছে কতখানি স্বীকৃতি লাভ করেছেন, তা আজ সন্দেহের বিষয়। কারণ এ কথা রূঢ় সত্য যে, তাঁর অন্য অনেক বন্ধুর মতো তিনিও আজ বিস্মৃতপ্রায়। এর একটি কারণ হয়তো রামকমল সেন সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা; রামকমল রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁর রক্ষণশীলতার প্রমাণ—তিনি হিন্দুকলেজ থেকে ডিরোজিওকে বহিষ্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ধরনের একটি দুটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করে কা'রো ব্যক্তিত্বের বিচার কতখানি বিজ্ঞানসম্মত, বলতে পারি না।

রামকমল রক্ষণশীল ছিলেন বিশেষার্থে—'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'নব্য বঙ্গ'-এর সূত্রে। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অনিকেত মনোভাব বা কেন্দ্রাতিগ আন্দোলনকে রামকমল এবং তাঁর বন্ধুরা কখনও সমর্থন করেননি। এবং আজ—বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে—নিরাসক্তভাবে সেকালের বিচারে বসলে বোধ করি রামকমলের 'ইয়ং বেঙ্গল'-বিরোধী মনোভাবের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যাবে।

বিপরীতপক্ষে, এমন কিছু ঘটনা—সাক্ষ্য-নজীর আছে যেগুলি নিঃসন্দেহেই রামকমলের প্রগতিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। দেশে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রসার, জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মানুগ রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন প্রভৃতি প্রগতিমুখী কাজে রামমোহনপন্থী সংস্কারকদের সঙ্গে তথাকথিত রক্ষণশীল রামকমলরা যে একযোগে কাজ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, এ কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ("এ দেশের উন্নতির জন্যে উপরপড়া হয়ে তিনি কিছু করেননি, কিন্তু সে উন্নতির তিনি ছিলেন সমর্থক এবং সে উন্নতিবিধানে তিনিও প্রয়াসী ছিলেন"—সমসাময়িক উইলসনের এ মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। *১ রাধাকান্ত দেবের মতো তথাকথিত রক্ষণশীল মুখ্যও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যে আশ্চর্য আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, ঘটনা হিসাবে তা কি বিস্মরণীয়?

রামমোহনের বিপরীত মেরুর বাসিন্দা সেকালে ছিলেন না, এমন কথা মনে করার কারণ নেই। কিন্তু দু'টি একটি ঘটনার বিচ্ছিন্ন বিচারে রামকমলকে সেই বাসিন্দাদের একজন মনে করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। উনিশ শতকের বাংলায় প্রগতিশীল, একটু অন্যভাবে, সংস্কারপন্থী সংস্কারবিরোধী শক্তির মধ্যে তৃতীয় একটি সমাজশক্তি ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল। সেই তৃতীয় সমাজশক্তিরই ব্যক্তি-প্রমূর্তি রামকমল সেন, সাধারণের ভ্রান্ত বিচারে যিনি সংস্কার-পরিপন্থী রক্ষণশীল-প্রধানদের অন্যতম।

সারতঃ, রামকমল সেন ও তাঁর অনুবর্তিগণ সংস্কারের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ঐতিহ্যের নামে প্রাচীনলগ্নতা---উভয়েরই বিরোধিতা করেছিলেন। তাই আপাতবিরোধী সুরেই বলা চলে, রামকমল ছিলেন প্রগতিপন্থী রক্ষণশীল।

শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল আমার

১ সম্পাদকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

অনুরোধে বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদন করে আমার প্রতি তাঁর প্রীতির পরি-
চয় দিয়েছেন। এ জন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-নিরপেক্ষ
বলেই মনে করি।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

প্রকাশকের নিবেদন

সৎ গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা যাতে বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বেশি দিন পরিগণিত না হতে পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা 'সম্বোধি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' প্রকাশ করব স্থির করেছি। গ্রন্থমালার পরিকল্পক ও সাধারণ সম্পাদক কল্যাণকুমার দাশ-গুপ্তের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর তিনটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারব বলে আমরা আশা রাখি।

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রামকমল সেন' ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের Life of Dewan Ramcomul Sen-এর বঙ্গানুবাদ। সুপ্রসিদ্ধ গবেষক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল গ্রন্থটি সম্পাদনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সৎ পাঠকের উপর ভরসা করেই সৎ গ্রন্থের প্রকাশনাকে আমরা আনন্দময় কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছি। হিসেবে ভুল করিনি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সূচীপত্র

মূল গ্রন্থ

সম্পাদকীয়

রামকমল সেন

Ram Comul Sen

রামকমল সেনের প্রতিকৃতি

'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বৈদ্য রাজাদের অর্থাৎ সেন বংশীয়দের উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন কোন প্রাচ্য পণ্ডিত বলেন যে, সেনেরা কায়স্থ ছিলেন। সেনদের মধ্যে বল্লাল ও লক্ষ্মণ ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী। বৈদ্যেরা উপবীতধারী দ্বিজ হিসাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সমতুল্যতাই শুধু দাবি করেননি, পণ্ডিত ও লেখক বলেও তাঁদের খ্যাতি ছিল। তাঁরা সাধারণ শিক্ষা লাভ করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যার সর্ব-বিভাগে পারদর্শিতা অর্জন করে তাকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য লেখকের নাম—'নিদান'-এর লেখক মাধব কর, 'বৈদ্য মধুকোষে'র লেখক বিজয় রক্ষিত, 'সাহিত্যদর্পণে'র রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ, 'চক্রদত্ত'-প্রণেতা চক্রপাণি দত্ত, 'রত্নাবলী'র রচয়িতা কবিচন্দ্র এবং ভরত মল্লিক।

বাঙলা দেশ মুসলমানদের হস্তগত হওয়ার পূর্বে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির লোকেরা এই দেশের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করেছিল। মনু ও কোলব্রুক বলেন যে, বৈদ্যজাতি বৈশ্যমাতা ও ব্রাহ্মণপিতার সন্তান। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা সত্য হলেও প্রাচীন ভারতে প্রথমে কোন জাতি ভেদ ছিল না। প্রাচীন ভারতে বৃত্তি অনুযায়ী বর্ণনির্দেশের ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং জন্মের বিচারে জাতিসৃষ্টির বিষয়ে অনুসন্ধান করার কোন ভিত্তি নেই।

তখন একজন চণ্ডাল পুণ্যাত্মা হলে তাকে একজন ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হত।

রামকমল সেনের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের বল্লাল সেনের বংশধর ব'লে দাবি করতেন, তাঁরা হুগলী নদীর অপর তীরে ২৪ পরগণা জেলার গরিফা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বল্লাল ছিলেন আদিশূরের দৌহিত্র। রামকমল গোকুলচন্দ্রের পুত্র। তিনি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মদন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামধন। রামকমলের পিতা কোন বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ছিল বংশমর্যাদা, আর ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠা।

রামকমল যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন সবে কলকাতার পত্তন হয়েছে। এর মূলে ছিলেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট জব চার্নক। ১৬৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেন। তখন সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এই মহিলাটিকে সতী হিসাবে দাহ করার ব্যবস্থা করা হলে জব চার্নক তাঁকে উদ্ধার করেন। কলকাতা তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। সেই জন্যে হুগলী থেকে যাওয়া-আসার পথে বৈঠকখানার এক ছায়াবহুল গাছের নীচে তিনি বিশ্রাম করতেন। চার্নক হুগলীর ফৌজদারের দ্বারা উত্যক্ত হন এবং যে জায়গায় উক্ত গাছটি দণ্ডায়মান ছিল সেইটিকেই তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মস্থল করবেন বলে স্থির করেন। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি গোবিন্দপুর, সুতানটি ও কালী দেবীর নামানুসারে অভিহিত কলকাতা গ্রামগুলির জমিদারীস্বত্ব ক্রয় করার অধিকার পেয়ে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে সেইগুলি ক্রয় করে।

ফেয়ারলি প্লেস, কাস্টমস্ হাউস ও কয়লাঘাটের উপরে তখন দুর্গ তৈরি করা হয়। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার চাঁদপাল ঘাটের দক্ষিণ দিককার সমস্ত জায়গা ছিল নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ। অনেক মাটির ঘর ছিল এখানে-ওখানে ছড়ানো। সমস্ত পরিবেশটা ছিল শ্বাসরোধকারী। তখন কলকাতার সীমা ছিল চীৎপুর থেকে কুলি বাজার পর্যন্ত। ক্রমে এই সীমা সিমলা, মলঙ্গা, মির্জাপুর, হোগলকুড়িয়া এবং সর্টস্‌বাজার অবধি বিস্তৃত হয়। কলকাতায় তখন সবচেয়ে প্রাচীন হিন্দু পরিবার ছিলেন শেঠ ও বসাকেরা। তাঁরা ব্যবসায়ী ও কারবারী ছিলেন এবং ইংরেজ বণিকদের বস্ত্রাদি পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করতেন। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে ইওরোপীয়, মোগল ও আরমানীরা এখানে আসতেন। ব্যবসায় বেশ তেজেই চলত। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে "এখানে অনেক ধনী ব্যবসায়ী ছিল, টাকাকড়ির লেনদেন যথেষ্ট হত, শ্রমিকও সস্তায় পাওয়া যেত এবং ভারতে একটিও দরিদ্র ইওরোপীয় ছিল না।" ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা কলকাতা অধিকার করেন এবং ভয়াবহ অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হয়। ১৭৫৭ সালে ইংরেজেরা কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন। তখন একজন জমিদার কলকাতার শাসক ছিলেন। তিনি একাধারে এর কালেক্টর, বিচারক ও পুলিস-পরিচালক। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হল। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পুলিস-বিভাগ পুনর্গঠিত হল এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পরিরক্ষণের মহাধ্যক্ষেরা নিযুক্ত হলেন। তাঁরা দোকান-ভাড়ার প্রতি টাকার উপর দু' আনা ও ঘর-ভাড়ার উপর এক আনা কর ধার্য করলেন।

তারপর পুলিস-বিভাগ পোষণের জন্যে এবং তাদের সংরক্ষণ, কার্যপ্রণালী-নির্ধারণ ও ক্ষমতা-সম্প্রসারণ সম্পর্কে কতকগুলি আইন-কানুন রচনা করা হল। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'জেণ্টল্‌ম্যান্‌স্‌ ম্যাগাজিন' পত্রিকায় লিখিত আছে—"ইউরোপীয় বাণিজ্য ঈস্ট ইণ্ডিজে যতটা প্রসার লাভ করেছিল, তার আর কোন শাখাই কোথাও ততটা উন্নতি লাভ করেনি।" ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুআরি তারিখে স্যর জন রিচার্ডসন ও অন্যান্য ব্যক্তি জাস্টিস অফ্‌ পীস্‌ নিযুক্ত হন। অধিবাসীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছিল, অনেক পুরনো বাসিন্দা গোবিন্দপুরে আস্তানা গাড়লেন, তার পর নূতন দুর্গ ফোর্ট-উইলিয়ম নির্মাণের সময় তাঁদের সেখান থেকে সরে আসতে হল।

যে সকল আরমানী ও পোর্তুগীজ কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা চার্নকের আহ্বানে আবার ফিরে আসতে লাগলেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা ছিল একচেটিয়া। ব্যক্তিগত শিল্প প্রচেষ্টাকেও তখন নিরুৎসাহিত করা হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যবসাদারদের মুনাফা বেড়েই চলছিল। স্টেভোরিনাস এই কথাই প্রামাণিক ভাবে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে লিখে গিয়েছেন। কলকাতা শহরের ব্যবসায়-কেন্দ্রটি ক্রমেই নানা দেশের লোকে পূর্ণ হতে লাগল। এখানে আমদানি রপ্তানি, জাহাজ তৈরি, আদালত স্থাপন, সরকারী অফিস নির্মাণ, বণিক-অফিসে সহকারী লোক গ্রহণ, এই সব ব্যাপারে বাঙালীরাই নিযুক্ত হতে লাগল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী বেনিয়ান, সরকার ও লিপিকারেরাই কলকাতা শহরে বেশির ভাগ খুচরা ব্যবসা চালাতেন। কতিপয় বাঙালী ধনী ইওরোপীয় সমাজে বিশেষ সমাদর পেতে লাগলেন।

কিন্তু এই সময়ে শিক্ষাক্ষেত্র উপেক্ষিতই রয়ে গেল। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গুটিকয়েক বাঙালী বালকবালিকা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হল। বানান শিক্ষা ও হাতের লেখা শেখবার বই বাঙালীদের পরিবারে প্রচলিত করা হয়। এবং যাঁরা ইংরেজীতে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলতে পারতেন তাঁরা, হয় বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতেন, নয়তো নিজেরাই স্কুল খুলে বসতেন। কিছু ইংরেজী জ্ঞান থাকলেই অর্থোপার্জন সহজ হবে, এই ধারণাই তখন লোকের মনে জেগে উঠেছিল। এই রকমই ঘটেছিল মুসলমান শাসনের সময়ে ফারসী শেখার ব্যাপারে। রামদুলাল দে-র মতো লোকেরা কিছু বাঙলা, কিছু হিসাবপত্র, কিছু ইংরেজী শব্দ ও কিছু ইংরেজীতে কথা বলার কৌশল শিখে নিয়ে আরমানী জাহাজের ও বণিকদের অধীনে জাহাজ-সরকার ও বেনিয়ানের কাজ যোগাড় ক'রে নিতেন। এতে যথেষ্ট আয় হ'তে দেখে লোকেরা আরও আগ্রহের সঙ্গে ইংরেজী শিখতে লাগলেন। সময়ে সময়ে খারাপ ইংরেজী, ভাঙা ইংরেজী বা আধা ইংরেজী বলেই কাজ সমাধা করা হত। অনেক সময় হাত-পা নেড়ে মুখভঙ্গি ক'রে মনের ভাব ব্যক্ত করা হত, যেমনটি গালিভার লিলিপুটবাসীদের কাছে করেছিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষার প্রসারের জন্যে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করা হল।

অনেক বিশিষ্ট এদেশীয় পরিবার কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন। ফোর্ট উইলিয়মের নির্মাণকালে ঠাকুর পরিবারভুক্ত জয়রামও এখানে থাকতেন। নবকৃষ্ণ ছিলেন ক্লাইভের কর্মচারী। নকুড় ধর, যিনি একসময়ে কয়েক সহস্র নগদ টাকা গভর্নমেণ্টকে ধার দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়, তিনিও হলেন কলকাতার

একজন প্রাচীন অধিবাসী। এঁরই বংশে রাজা বৈদ্যনাথ ও রাজা নৃসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। মদনমোহন দত্ত, যিনি রপ্তানি-আড়তের দেওয়ান ছিলেন, তিনিও হলেন রাজা নবকৃষ্ণের সমসাময়িক। রামদুলালের মা ছিলেন এঁরই পাচিকা, আর মদনমোহনের ছেলেদের গৃহশিক্ষকের কাছে রামদুলালও শিক্ষালাভ করেন। তখনকার দিনে মুসাবিদা করা, জমাখরচ লেখা আর জমিদারী হিসাবপত্র রাখা উল্লেখযোগ্য গুণ বলেই বিবেচিত হত।

রামকমলের পিতা ফারসী ভাষা জানতেন আর তিনি মাসিক ৫০ টাকা বেতনে হুগলী আদালতে সেরেস্তাদারের কাজ করতেন। রামকমল এই সময়ে শিরোমণি বৈদ্য নামক এক শিক্ষকের কাছে সংস্কৃত ভাষার মূল সূত্র শেখেন। বেশী কিছু শিখতে চাইলে তিনি রামকমলকে ভৎর্সনা করতেন। রামকমল বলতেন, "মানুষের ক্ষুধা অনুযায়ী খাওয়া উচিত।" তারপর রামকমল কলকাতায় এসে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কলুটোলায় রামজয় দত্তের কাছে ইংরেজী শিখতে লাগলেন। রামকমল বলেছেন, "আমি তখন একজন হিন্দু পরিচালিত এমন একটি স্কুলে ইংরেজী পড়তাম, যেখানে 'তুতিনামা' ও 'আরব্য উপন্যাস' থেকে কিছু কিছু অংশ ছেলেরা পড়াশুনা করত। কিন্তু সেখানে না ছিল কোন অভিধান, না ছিল কোন ব্যাকরণ।" এখন যেখানে কলুটোলা স্ট্রীট সেখানে তিনি একটি ছোট বাড়ি কেনেন। আবার এটা বিক্রি করে তিনি কলুটোলায় মাধবচন্দ্র সেনের বাড়িটি কেনেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন মুদ্রণপ্রণালী জানা ছিল না। তা ছাড়া, ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেকার কোন বাংলা গ্রন্থ তখনও সংগৃহীত

হয়নি। বাংলা ভাষায় 'চৈতন্যচরিত' প্রথম জীবনীগ্রন্থ। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের বৈদ্যবংশীয় একজন শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন। তারপরে আমরা পাই—'মনসা', 'ধর্মমঙ্গল', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' ও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। শেষোক্ত দু'খানি গ্রন্থ নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্যে রচিত হয়েছিল। পাঠশালায় যে বই পড়ানো হ'তো সে দুটি 'গুরুদক্ষিণা' আর 'শুভংকরী'। রামকমলের ক্ষেত্রে স্কুলের শিক্ষায় মানসিক উন্নতি তেমন কিছু হয়নি। ভাল স্কুল বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। আর সে সময়ে কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পুস্তকেরও খুবই অভাব ছিল। রামকমলের আর্থিক অবস্থা এমন সচ্ছল ছিল না যাতে তিনি গৃহশিক্ষক রেখে পড়তে পারেন।

দারিদ্র্যের জন্যেই রামকমল শিক্ষালাভ করতে কলকাতা ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারেননি। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর তারিখে এই কলকাতাতেই তাঁর জীবনযাত্রা শুরু হয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মিঃ নামির অফিসে এক চাকরি নিলেন তিনি। কলকাতার তৎকালীন প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্লাকোআরের এক সহকারী ছিলেন এই নামি সাহেব। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে রামকমলের বিবাহ হয়। এই বৎসরেই তাঁর পিতা তৎকালীন গভর্নমেণ্টের বেসামরিক স্থপতি মিঃ আর. ব্রেকিন্‌ডেন সাহেবের কাছে রামকমলকে নিয়ে আসেন এবং সেখানে তিনি শিক্ষানবিসরূপে কিছুকাল কাজ করেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক ৮ টাকা বেতনে হিন্দুস্থানী প্রেসে

তিনি কাজ করতে থাকেন। তারপর ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাঁদনি হাসপাতালের কাজে নিযুক্ত হন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্নেল রামসের অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেন। ১৮১৮ হইতে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে মাসিক ১২ টাকা বেতনে কেরানীর কাজ করতে থাকেন। বোধ হয় তিনি হিন্দুস্থানী প্রেসে কাজ করার সময়ে ডাঃ এইচ. এইচ. উইলসন সাহেবের সুনজরে পড়েছিলেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির কাজ তিনি এমন সুচারুভাবে করেছিলেন যে, পরে তিনি এখানে বাঙালী সেক্রেটরি ও কাউন্সিলের বাঙালী সভ্যরূপে স্থান লাভ করেন।

রামকমলের জীবন পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার জীবন। জ্ঞানপিপাসা ছিল তাঁর অপরিসীম। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েও তাঁর আত্মিক উন্নতি কোনোদিনই ব্যাহত হয়নি। স্কুলে বিদ্যালাভ শুধু পাঠ মুখস্থ মাত্র এবং এতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। কবি ওআর্ডস্‌ওআর্থ বলেছেন,—

"বন্ধু, এইভাবে শৈশব থেকে আমার চিন্তাধারা ধীরে ধীরে মানবজাতি ও মানবের ভালমন্দের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকৃতি মানুষকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করেছে।"

এই ছিল রামকমলের আত্মিক বা অধ্যাত্মচেতনা।

কালক্রমে রামকমল ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। প্রাচীন বাঙলা ভাষায় ও সংস্কৃতে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। বুদ্ধির প্রাখর্যে ও উচ্চধরনের নৈতিক আদর্শের অনুসরণে তিনি শুধু যে এই দেশের বন্ধুবান্ধব লাভ করেছিলেন তা নয়, ইওরোপীয় সমাজের বহু ব্যক্তি ও সরকারী কর্মচারীদের

অনেকের সঙ্গেই তাঁর সৌহার্দ্য ঘটেছিল। ৮ টাকা বেতনের কম্পোজিটরের চাকরি থেকে তিনি এখন কলকাতার টাঁকশালে দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। এখানে তিনি যে কর্মক্ষমতার পরিচয় দিলেন তাতে তাঁকে পরে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের দেওয়ানের পদে উন্নীত করা হয়। এই কাজে সব জায়গায় তাঁকে প্রচুর পরিমাণে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বিশেষ বিবেচনাশক্তির প্রয়োগ করতে হত। ব্যাঙ্কের সেক্রেটরি মিঃ জর্জ উড্নীর তিনি দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। যে-কোন কারণেই হোক্ জর্জ উড্নীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে ওঠে। এ কথা ডিরেক্টরদের মধ্যে জানাজানি হলে, রামকমল তেজের সঙ্গে সব কথা প্রকাশ ক'রে দেন এবং প্রমাণিত হয় যে, তাঁর কোন দোষ নেই। তাঁর উপর ডিরেক্টরদের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং প্রত্যেক সভায় তাঁকে আহ্বান ক'রে তাঁরা তাঁর সুযোগ্য উপদেশ গ্রহণ করতেন।

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রামকমলের চিন্তাধারা এবার দেশের উপকারের খাতে বইতে লাগল। ভারতের নিরক্ষরতা দূর করতে হ'লে, ইংরেজী ও মাতৃভাষার যে সম্যক প্রয়োজনীয়তা আছে তা তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করলেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুআরি তারিখে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। সেই বৎসরেই প্রয়োজনের তাগিদে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি জন্ম লাভ করে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পাবলিক ইনস্ট্রাক্সনের জন্যে একটি জেনারল কমিটি গঠিত হয়। হিন্দু কলেজের সঙ্গে তার পরিচালক

সমিতির সভ্যরূপে রামকমল সেনের সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল। কার তাঁর 'পাবলিক ইনস্ট্রাক্সনে'র সমালোচনায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসাবে রামকমলের নাম উল্লেখ করেছেন। নিজে একজন খাঁটি গোঁড়া হিন্দু হওয়ায় তাঁর কাছে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতাকে যে কোন প্রকারে বাধা দেওয়া এক পবিত্র কর্ম বলে বিবেচিত হত এবং সেইজন্যই তিনি হিন্দু কলেজ থেকে মিঃ ডিরোজিওকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে সহায়তা করেন। এই সময় দেখা গিয়েছিল যে, ডিরোজিওর শিক্ষা এমন এক যুবক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে যারা হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট এবং যারা এমন এক ভাবপ্রবণ মতবাদে শহরের প্রতিটি স্থানকে সংক্রামিত করে দিচ্ছিল, যা প্রচলিত ধর্মের পক্ষে মারাত্মক। রামমোহন রায় স্বাধীন জিজ্ঞাসা ও চিন্তার অগ্রগতিতে যে বেগশক্তি সঞ্চার করেছিলেন তা ইতোমধ্যেই গোঁড়ামিতে আঘাত দিয়েছিল। তাই এই যুবক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা ও অমিতাচারকে আর সহ্য করা যাচ্ছিল না।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রামকমল কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভ্য ছিলেন। তখন সার্ এডওআর্ড রায়ন, মিঃ সি. এইচ. ক্যামেরন, ডাঃ গ্রাণ্ট এবং অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সমিতির কর্ণধার ছিলেন। প্রথম থেকেই স্কুল বুক সোসাইটির সভ্যরূপে তিনি অনেক ভাল কাজ করেছিলেন। এই সময়ে কারো পরামর্শে ইংরেজী ও বাংলা অভিধান প্রণয়নের পরিকল্পনা তাঁর মনে আসে। তিনি ডাঃ কেরীর সহকর্মী ছিলেন এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল

সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির দেশীয় সেক্রেটরি ও কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত হন। 'ট্রানজাকসনস্' নামক পত্রিকায় তিনি কাগজ-প্রস্তুতের পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির সহ-সভাপতি হন।

সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর এতটা অনুরাগ ছিল যে, তিনি হিন্দু কলেজের পাশে একটি বাড়ি তৈরি করেন। এটি এখন 'অ্যালবার্ট হল' নামে পরিচিত। এখানে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত করতে ভালবাসতেন। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে তিনি সেক্রেটরি হিসাবে যুক্ত ছিলেন। দেশের শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি তাঁর এই আগ্রহ দেখে তাঁকে পেরেন্ট্যাল অ্যাকাডেমির (এখন তার নাম 'ডাভাটন কলেজ' হয়েছে) পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়। যে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে তিনি অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন, তা যদিও তাঁর দেশবাসীদের পরিবর্তে সর্ববিষয়ে বিদেশী একটি জাতির উপকার সাধন করেছিল, তবুও তিনি শিক্ষানুরাগের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই গুরুভার গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। কেননা শিক্ষা যে কল্যাণপ্রসূ, এই বিশ্বাস তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল।

ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতেও রামকমল সেন একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। অবশ্য এদেশের দাতব্য প্রতিষ্ঠান-গুলিতে যেভাবে জনসেবা করা হয়, এখানে ঠিক সেরকমটি হত না। কলকাতায় এদেশীয় দরিদ্রদের সাহায্যের জন্যে একটি

সাবকমিটি স্থাপিত হলে শহরটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলির সীমা নির্দিষ্ট করা হয়। রামকমল সেন এদেশীয় ধনীদের মধ্যে একটি বক্তৃতা প্রচার করে তাতে এই সোসাইটিকে সাহায্য করবার জন্যে তাদের আহ্বান জানান। এতে তিনি 'দয়ালুদের বিবেচনারহিত দক্ষিণার কুফল এবং রোগের যন্ত্রণাময় ক্লান্তি ও সংক্রমণ' সম্পর্কে মন্তব্য করেন। তাছাড়া 'কোনো ধনী আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে দূর দেশ থেকে অপরিচ্ছন্ন সন্ন্যাসীরা সমবেত হলে রোগে তাদের যে জীবনহানির আশঙ্কা পর্যন্ত হত' সে সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করেন। পূর্বোক্ত কমিটি ছিল কয়েকজন ইওরোপীয় এবং এদেশীয় ভদ্রলোককে নিয়ে গঠিত। রামকমল ছিলেন এঁদের অন্যতম। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এই সকল কাজে আগ্রহের জন্যেই তাঁকে সহ-সভাপতি করা হয়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামকমল ইংরেজী ও বাঙলা অভিধান লেখা শেষ করেন। অভিধানখানি ৭০০ পৃষ্ঠার বই হয়ে দাঁড়ায়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান সাহেব এই অভিধানখানিকে এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণ ও মূল্যবান এবং রামকমলের পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও পাণ্ডিত্যের স্থায়ী নিদর্শন বলে গণ্য করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্যে তাঁর নাম ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হওয়ার আগে বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কলকাতায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ জানানোর উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। রামকমল তার একজন সভ্য ছিলেন।

DICTIONARY

IN

ENGLISH AND BENGALEE;

TRANSLATED

FROM

TODD'S EDITION OF JOHNSON'S ENGLISH DICTIONARY

IN TWO VOLUMES

BY
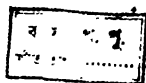
RAM COMUL SEN,

NATIVE SECRETARY TO THE ASIATICK AND AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETIES
MEMBER A. S. & A. H. S. and M. S. P. S. OF BENGAL

VOL. I.

FROM THE SERAMPORE PRESS.

1834

রামকমল সেনের ইংরেজী-বাংলা অভিধান গ্রন্থের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি

রামকমলের কাছে ডাঃ এইচ. এইচ. উইলসন যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তাদের কয়েকখানি নীচে দেওয়া হ'ল। আমাদের ইচ্ছা রামকমলেরও পত্র থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া, কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করা সময়সাপেক্ষ।

৫ই জানুআরি, ১৮৩৩

"আমি আশা করি যে, যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনি অধিষ্ঠিত আছেন আরো কয়েক বৎসর পরে আপনার পুত্রদের মধ্যে একজনের উপর তাদের ভার ন্যস্ত করে আপনি সসম্মানে অবসর গ্রহণ করে আরাম উপভোগ করতে পারবেন। তখন পরবর্তী বংশধরদের যে উন্নতিসাধনে আপনি এতো বেশী উদ্যমের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন শুধু তাতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখার সুযোগ পাবেন।"

২৩শে ফেব্রুআরি, ১৮৩৩

রামকমলের গুণ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা—"আমি কোনোদিন চুপ করে বসে থাকা পছন্দ করি না। কিন্তু আপনি শ্রমের আদর্শে দেখছি আমারও উপর গিয়েছেন। আপনার উভয় পুত্রকেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা দেবেন। তাঁদের নিশ্চিত জানাবেন যে, তাঁরা আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিভা, শ্রম ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভের জন্যে আপনার মতো চরিত্র গঠন করছে, এই কথা শোনার চেয়ে বেশী আনন্দ আমাকে আর কিছুই দিতে পারবে না। শেষোক্ত গুণ দুটি তারা চেষ্টা করলেই অর্জন করতে পারে। প্রতিভা কতক পরিমাণে জন্মগত ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতিগত শক্তির ন্যূনতা না থাকলে সাধারণ শ্রমের দ্বারাও যে পরিমাণ প্রতিভা অর্জন করা যায় তাতেই প্রত্যেক মানুষ সম্মান ও সাফল্যের সঙ্গে জীবন কাটাতে পারে।"

২৭শে জুন, ১৮৩৩

"প্রথমে চিঠি লিখেছি মিঃ সিডন্সকে, তারপর লিখতে বসেছি আপনাকে। আমি এখনও রামমোহন রায়ের দেখা পাইনি এবং তিনি কি নিয়ে আছেন তাও জানি না। লণ্ডন শহর একটি মস্ত বড় জায়গা,

এখানে রাতদিন হৈ-চৈ আর সকলে সবসময় আপন আপন কাজে এমনই ব্যস্ত যে, এখানে হঠাৎ একলা গিয়ে পড়লে নিজেকে বড় তুচ্ছ অসহায় বোধ হয়।

ইংরেজ জাতি—এখানে কখনো ঠাণ্ডা, কখনো গরম, কখনো বৃষ্টি নেমে আসে, আবার কখনো সূর্যকিরণ ঝলমল ক'রে ওঠে। এতে অবশ্য ফসলের খুবই সুবিধা হয়। শস্য, ফল ও ফুল পর্যাপ্ত পরিমাণেই হয় বা হওয়া সম্ভব। লোকেরা কিন্তু গভর্নমেণ্টের উপর বিরক্ত ও অপ্রসন্ন, আর তা ছাড়া নিজেদেরও বেশ সক্রিয় ব'লে মনে করে না। সত্যি কথা বলতে কি, দোষটা তাদের নিজেরই। তারা যা কিছু উপায় করে, তার চেয়ে বেশি খরচা করে। এই বোকামির জন্যে তাদের পরে পস্তাতে হয়। তখন তারা দুর্দিনের কথা, গভর্ণমেণ্টের ট্যাক্সের চাপের কথা, এই সবই বলাবলি করে। একটি চিঠিতে বলা হয়েছে যে, তারা যে সঙ্গতি-হীন, একথা সত্য নয়। ইংরেজ অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা নর্তক-নর্তকী বা অন্যান্যদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। যেসব ইতালীয় গায়ক-গায়িকা, ফরাসী নর্তক-নর্তকী ও অন্যান্য বিদেশীরা ইংরেজদের আনন্দ বিধান করতে আসে শুধু তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যেই এরা একদিনে এক লক্ষ টাকা চাঁদা তুলতে পারে। অবশ্য এ ধরনের লোক কলকাতায় না থাকা সত্ত্বেও সেখানে আপনি অনেক বেশী সুখে আছেন। লণ্ডনের বিশিষ্ট লোকেরা নিজেদের পৃথিবীর মধ্যে বিজ্ঞতম ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। তবে আপনি তাদের চেয়ে সঠিক ও অবিচলিত ভাবে কর্মে নিযুক্ত আছেন। প্রাচ্যের বন্ধুদের, বিশেষ করে আমার 'দেশীয়' বন্ধুদের, আমার অনেক বেশি পছন্দ হয় তাঁদের শুভবুদ্ধির জন্যে।"

এরপর ডাঃ উইলসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার 'বোডেন প্রফেসর' রূপে নিযুক্ত হন। সেখান থেকে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর তারিখে তিনি আর একটি চিঠিতে জানান,—

রামমোহন রায়—"রামমোহন রায়ের দেখছি শীঘ্র এখান থেকে দেশে ফেরার আর ইচ্ছে নেই। ভাগ্য দেখছি তাঁকে এখানেই আটকে রেখেছে। আমি কিন্তু এর জন্যে খুবই দুঃখিত। এখান থেকে দেশে ফিরে যাবার সময় যে জ্ঞান নিয়ে তিনি এদেশে এসেছিলেন, সেটা যে অনেক বেড়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।"

সনদ—"প্রাচ্য দেশসমূহের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক কিছু পরিবর্তন উপলক্ষে আপনি দেখছি বিশেষ ব্যস্ত আছেন। রাজস্বের বিষয়ে বেশী চাপ দিলে তাতে সরকারের লাভ হ'তে পারে, কিন্তু কষ্টে ভুগবে দেশের জনসাধারণ।"

২১শে ডিসেম্বরের চিঠিতে ডাঃ উইলসন লেখেন,—

বাণিজ্যিক বিফলতা—"কলকাতার কৌন্সিল সম্পত্তির উচ্ছেদ ও তার সঙ্গে সুনামনাশেরও যে পথ ধরেছে তাতে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি। ঝড় এলে যেমন বদ্ধ বাতাসের সংশোধন হয়, তেমনি বাণিজ্যের ব্যাপারেও দেশের ভালই হবে। পদ্ধতিটির একেবারে ভিতর পর্যন্ত জীর্ণ হলেও ক্রমে সেটা লোকহিতকর হ'য়ে দাঁড়াবে ব'লে আমি মনে করি।"

হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন—"আমি আশা করি, রাষ্ট্রনীতিসংক্রান্ত ধনবিজ্ঞান এখন শেখানো হবে না, এগুলি বিশেষ কোন কাজে আসবে না এবং আইনসংক্রান্ত শিক্ষাদান এ-অবস্থায় ভালই হবে।* তবে এটা উপযুক্ত লোকের দ্বারা হওয়া চাই।"

সংস্কৃত কলেজ—"এর অবস্থা হিন্দু কলেজের চেয়েও খারাপ। কেননা শিক্ষা কমিটি ইংরেজীর দিকেই বেশী আসক্ত বলে মনে

*১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ থিওডোর ডিকেন্স আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ব্ল্যাকস্টোন থেকে বক্তৃতা দেন এবং আমি বলব তাঁর বক্তৃতাকে তিনি ফলপ্রদ করে তুলতে পারেননি। বোম্বাই থেকে আসার পরে সার জন গ্রাণ্ট তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ব্যবহারবিদ্যা, নীতি-বিদ্যা ও অধিবিদ্যা বিষয়ক তাঁর বক্তৃতাগুলি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

হয়। তাঁদের এই অবিমৃষ্যকারিতায় তাঁরা ভালোর চেয়ে মন্দই করেন বেশি এবং পণ্ডিত ও মৌলবী, এই দুই গুণী সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিরক্তি উৎপাদন করেন। আমার মনে হয়, পণ্ডিত আর মৌলবীদের যদি সুযোগ দেওয়া যায় ও ঠিকভাবে চালিত করা হয় তা হলেই সুফল ফলতে পারে। আমি প্রিন্সেপ সাহেবের কাছ থেকে কিছু কিছু ব্যাপার জানতে পেরেছি। আর কমিটি যে এ বিষয়ে সুচিন্তিত পথ না ধ'রে একগুঁয়েমির পথ ধরেছেন এর জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত।

রামমোহন রায়—"আগের চিঠিতে আমি রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছি। তার পর হেয়ার সাহেবের ভাই-এর সঙ্গে আমার এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। জ্বরবিকারে রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেছেন। ইদানীং তাঁর স্বাস্থ্য ভালই দেখা গিয়েছিল। মস্তিষ্কের রোগ নির্ণয়ের জন্যে কোন চিকিৎসা হয়নি। আমার মনে হয়, যকৃতের গোলমালই তাঁর মৃত্যুর কারণ। অবশ্য মানসিক পরিশ্রমও তাঁর রোগ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। অর্থসংকটও তাঁর কম হয়নি। বন্ধুবান্ধবের কাছে প্রায়ই তাঁকে হাত পাততে হত। এতে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে খানিকটা লোক-জানাজানিও হয়ে গিয়েছিল। ইংলণ্ডের লোকেরা এ সব বিষয়ে খুবই সচেতন। তাঁর সেক্রেটরি স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট সাহেব তাঁর বাকি মাহিনার জন্যেও তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন এবং এমন ভয়ও দেখান যে, তাঁর বাকি মাহিনা না দিলে রামমোহন রায়ের লেখা পাণ্ডুলিপিগুলি তিনি তাঁর নিজের ব'লেই দাবি করবেন। এবং সত্যসত্যই এই দাবি রামমোহনের মৃত্যুর পর তিনি করেছেন। আসল কথা এই যে, রামমোহন রায় এমন কতকগুলি লোককে তাঁর সহকারীরূপে নিয়েছিলেন, যাদের কোনো নীতিজ্ঞান নেই, যাদের মন সংকীর্ণ এবং যারা অভাবগ্রস্ত। বড় দেরিতেই রামমোহন তাদের চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। এই সব কারণে নানা দুশ্চিন্তায় তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটেছিল। দোষ তাঁর যাই থাক, তিনি

যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তিনি তাঁর দেশের গর্ব।"

৬ই মার্চ, ১৮৩৪

ধর্মান্তরিতকরণ—"প্রলোভন দেখিয়ে খ্রীশ্চানধর্মে যে যুবককে আনা হয়েছিল ব'লে শুনেছি, তার সম্বন্ধে আদালতের রায় দেখে আমি সন্তুষ্টই হয়েছি। আমি যদিও মনে করি যে, ধর্মান্তরিতকরণ খুব ব্যাপকভাবে অবশ্যই হওয়া উচিত, তবুও আমার ধারণা মাতাপিতার আইনসঙ্গত অধিকারে থাকাকালে এবং নিজেদের চিন্তা বা কাজ করার ক্ষমতা বা অধিকার কোনটিই হওয়ার আগে ছোট ছেলেদের নিয়ে এর সূচনা হওয়া সঙ্গত নয়। আশা করি, এই রায় দেশীয় বন্ধুদের মনকে শান্ত করবে। এর পরে মা-বাপেরা তাঁদের ছেলেদের কলেজে পাঠাতে আর বেশি ইতস্তত করবেন না।"

সংস্কৃত—"আমি এখন সাংখ্যভাষ্যের অনুবাদ প্রকাশ করতে যাচ্ছি। এর সঙ্গে কোলব্রুক সাহেবের সাংখ্যকারিকার আর কৌমুদীর অনুবাদও থাকবে। এ সব কাজ আমায় নিজের জেদেই করতে হচ্ছে। এ দেশের লোকেরা সংস্কৃতচর্চা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সাহিত্যের দিক দিয়ে যেমন কিছু করে না, তেমনি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকেও বাদ দেয়। ভোজ খাওয়া, সামাজিক আপ্যায়ন আর রাজনীতি চর্চা, এই সবই হ'ল ইংরেজদের সবকিছু। নিজের দেশের লোকের সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই খারাপ।"

৩০শে মে, ১৮৩৪

ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল—"আমি খুবই দুঃখিত এই দেখে যে, আপনি, অন্য অনেকে ও আমি শোচনীয় বাণিজ্যিক বিফলতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এবং ব্যাঙ্কে আপনার বেতন আশাতীতভাবে কমে গিয়েছে। বাণিজ্য ব্যাপারে নানা ঘাটতি এলে ব্যাঙ্ককেও তার ফলভোগ করতে হয়। অবস্থা ভাল হ'লে ব্যাঙ্কের যে উন্নতি হবে এটা ঠিক। কৃত্রিম মূলধন দেখানোর চেয়ে, বাণিজ্য ব্যাপারের উন্নতির ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক গ'ড়ে উঠুক, এই আমি চাই।"

এশিয়াটিক সোসাইটি—"ইংরেজরা ও-দেশে যে সব প্রশংসার্হ কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা অন্যতম। এই সোসাইটির দ্বারা অনেক ভাল কাজ হয়েছে। এই সমিতির মধ্য দিয়েই জোন্‌স্‌ আর কোলব্রুক সাহেব ইওরোপীয়দের কাছে হিন্দুদের পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন। আমি এখন পর্যন্ত এখানকার সোসাইটিসমূহের সঙ্গে এটিকে তুলনা করার যে সুযোগ পেয়েছি তাতে এটিকে কোনদিক দিয়েই ছোট বলে মনে হয় না। এই সোসাইটির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের প্রতিভা ও কর্মশক্তি অন্য যে কোন সোসাইটির সভ্যদের সঙ্গে তুলনীয়; তাঁদের কার্যক্রম একই ধরনের শৃঙ্খলা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। ইংরেজদের নিজেদের বিষয়ে একটি অসুস্থ অহমিকা আছে, যার জন্যে তারা মনে করে যে, তাদের দেশের বাইরে যা কিছু সেগুলো খারাপ। কিন্তু আমার মনে হয়, বুদ্ধি এবং কর্মব্যস্ততার কেন্দ্র হিসাবে লণ্ডন শহরও কলকাতার চেয়ে খুব বেশি উন্নত নয়। অবশ্য এখানেও প্রতিভাবান অনেকে আছেন, কিন্তু সে প্রতিভা সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত নয়। এত গভীর আলস্য আমি আশা করি নি। খবরের কাগজ পড়ে আর রাস্তায় হেঁটে বেরিয়েই এখানে সময় কেটে যায়। অক্সফোর্ডের মতো জায়গাতেও পড়াশুনা কম হয়; একদিনে চার ঘণ্টার বেশি নয়, খুব বেশি হলে ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত,—তার পর লোকেরা বেড়াতে বেরোয় আর প্রায় ৫টা পর্যন্ত বেড়ায় বা ঘোড়ায় চড়ে। ৫টার সময় তারা 'ডিনার' সেরে নেয়, তার পর রাত ১০টা পর্যন্ত আলাপ-আড্ডা চলে। এর পর তারা শুতে যায় আর ঘুম ভেঙে ওঠে পরদিন সকাল ৮টায়। এই কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে কি কাজ হতে পারে?"

২০শে অগস্ট, ১৮৩৪

সংস্কৃত—"ভারতবর্ষে যদি সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহ জোগান না হয়, তাহলে পণ্ডিতেরা বাধ্য হয়ে ইওরোপের দিকে তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু লর্ড উইলিঅম বা মিঃ ট্রেভেলিঅনের কেউই বুঝতে পারেন না যে, তাঁরা

যদি সংস্কৃতকে অনাদর করতে চান, তাহলে তার ফল কি দাঁড়াবে। এর চর্চার উপরেই নির্ভর করছে ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানকে দেশীয় ভাষায় রূপদান করার সম্ভাব্যতা। ইংরেজীকে ভারতবর্ষের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার পরিকল্পনা অবাস্তব ও অসঙ্গত। ইংরেজীকে নিঃসন্দেহে ব্যাপকভাবে চর্চা করা উচিত, কিন্তু দেশীয় ভাষার উন্নতি তখনই ঘটবে যখন তাকে ইংরেজী ভাবের জন্যে সংস্কৃত শব্দের দ্বারা সমৃদ্ধ করা হবে এবং সেই উদ্দেশ্যেই ইংরেজী ও সংস্কৃতের চর্চা করা অবশ্য কর্তব্য।"

লর্ড উইলিঅম বেন্টিঙ্ক—"বেন্টিঙ্ক একজন বোধহীন ব্যক্তি। তাঁর মন সজীব, তাঁর দৃষ্টিও স্থির। কিন্তু পাঠের অভ্যাস তাঁর নেই এবং তাই বিচারেও তাঁর ভুল হয় প্রায়ই।"

ইংলণ্ডের সমাজ—"এখানকার লোকেরা নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, তারা অপরের দিকে বেশী মনোযোগ দিতে পারে না। তাদের নিজেদের মধ্যেও ওই একই ব্যাপার। ইংলণ্ডের ভেতরে আবার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের অস্তিত্ব আছে—ফ্যাশনের ইংলণ্ড, ক্লাসিক্যাল জ্ঞানের ইংলণ্ড, প্রাচীনের ইংলণ্ড, বিজ্ঞানের ইংলণ্ড, বিভিন্ন বৃত্তির ইংলণ্ড, বাণিজ্য ও ঝুঁকিদার ব্যবসায়ের ইংলণ্ড, রাজনীতির ইংলণ্ড। রাজনীতিতে আবার সকলেরই একটু আধটু ঝোঁক আছে। তবে আগেরগুলির ক্ষেত্রে যদি এক দলের কেউ অপর দলে কি ঘটছে সে সম্পর্কে কিছু জানে তাহলে সেটাকে নেহাতই আকস্মিক ব্যাপার বলে ধরে নিতে হবে। প্রত্যেকটি বিভাগই খুব বড় এবং তাদের সবকটিতেই অনেক সহস্র লোক রয়েছে। সেই জন্যে কৌতূহলের ক্ষেত্র বিরাট হলেও তা বিশেষ স্থানের মধ্যেই অসংবদ্ধভাবে সীমিত। যে সব বই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণালয়ে ছাপা হয়, রয়াল সোসাইটিতে সেগুলি সম্পর্কে উল্লেখ কখনো শোনা যায় না। অক্সফোর্ডে যে দার্শনিক সভা আছে তার কার্যবিবরণীর ছয়জন পাঠকও নেই। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যবিবরণী সম্পর্কে আবার অক্সফোর্ড বা রয়াল সোসাইটি—এ দুটির কোনটিরই জ্ঞান নেই।

কলেজের গ্রন্থাগার বা পাঠাগারে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ লিটারেচারের সভা বিবরণী পাঠিয়েও লাভ নেই ; তাদের একেবারে হাতের কাছের প্রকাশনা বা কার্যবিবরণীগুলিই তারা পড়ে দেখে না, সুতরাং বেঙ্গল রিসার্চেস বা এশিয়াটিক জার্নাল তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে আমাদের বিস্মিত হবার প্রয়োজন নেই। ইংলণ্ডে জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে কিছু লাভ নেই। উপন্যাস বা সংবাদ-পত্র ছাড়া অন্য কিছুর পক্ষে এই জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব নয়।"

রোমান অক্ষর—"মিঃ সিডনস আমাকে দেবনাগরী অক্ষরের পরিবর্তে রোমান লিপিমালা প্রবর্তনের একটি বিচিত্র পরিকল্পনা পাঠিয়েছিলেন। এই পরিবর্তন উৎকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক শব্দসমূহের স্থলে নিকৃষ্ট শব্দসমষ্টির প্রয়োগ এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে অসংগত একটি বর্ণমালার ব্যবহার সূচিত করত। তবে একটি মহৎ সান্ত্বনা হল এই যে, এধরনের অসঙ্গত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা সাধ্যের সীমার বাইরে। যা হবে না তার প্রতিবাদে সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া পরিকল্পনাটিতে মৌলিকতার গুণও নেই। গিলক্রাইস্টের 'শকুন্তলা', 'পলিগ্লট ফেবলস' প্রভৃতি দেখুন। কোনোদিন কি তাদের কেউ উলটে দেখেছে ? ট্রেভেলিঅন হলেন আর একজন গিলক্রাইস্ট ; তিনি বোধহয় কিছুটা বেশী শিক্ষিত ; কিন্তু দুজনেই একেবারে একই রকমের অসঙ্গতিতে পূর্ণ।"

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫

সময় কেমনভাবে কাটে—"ভারতবর্ষের চেয়ে ইংলণ্ডে অবসর অনেক কম, তবে কর্মকুণ্ঠতাও এখানে বেশি। কলকাতার মতো স্বচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা এখানে বসে থাকি না। রাস্তা সবসময়ই খোলা রয়েছে : হয়তো কোন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে, কোন জিনিস সংগ্রহ করতে হবে, অথবা বেড়াবার জন্যে বেরোতে হবে। এতে বাইরেই নষ্ট হয়ে যায় অনেক ঘণ্টা সময়, আর বাড়িতে যেটুকু সময় কাটানো হয়, তারও শান্তি ভঙ্গ হয় এতে। এছাড়া

গ্রীষ্মকালে লোকেরা তো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েই পড়ে, আর একেবারে কোন কাজ না করেই ছয় সপ্তাহ বা দু'মাস সময় কাটিয়ে দেয়।"

ভারতীয় বাণিজ্য—"এখানে চিনির শুল্ক কিছু কমিয়ে দেবার খুবই সম্ভাবনা আছে। এটি আপনাদের কৃষিকার্যে খুবই উৎসাহ জোগাবে। চায়ের আবিষ্কার যদি সুফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা অন্তত দেশের উত্তর-পূর্ব অংশের পক্ষে খুবই শুভ হবে। কিন্তু বৃহৎ কিছুর প্রস্তুতিতে কিছু সময় লাগে। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ইংলণ্ডের লোকেরা, বিশেষ করে যাঁরা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পার্লামেণ্টের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁরা লাভের লালসায় ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিচার দেখাতে পারে না। কিন্তু এতে ত্রুটি আপনাদেরই বেশি। আপনারা অত্যন্ত শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন। নৈতিক ও শারীরিক, এই দুই ধরনের শক্তি আছে। আপনারা কোনটিরই প্রয়োগ করেন না। দ্বিতীয় শক্তিটির প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু আপনারা প্রথমটির প্রয়োগ করতে পারতেন। আপনাদের উচিত সভা আহ্বান করা এবং বারবার আবেদন জানান। যখনই আপনারা মনে করবেন যে আপনাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, তখনই বার বার আপনারা বাঙলার সরকার, কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টর্স ও বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের কাছে আবেদন পাঠাবেন। যদি নিজেদের কেরানীদের উপর আপনাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে কলকাতায় অনেক চতুর ব্যারিস্টর আছে, তারাই এই সব আবেদনপত্র প্রস্তুত করে দেবে। কিন্তু আপনাদের অবশ্যই উচিত সভা আহ্বান করে আপনাদের অভিযোগগুলি সম্পর্কে সাহস করে বলা। কাউকে অভিবাদন জানাতে গেলে তো আপনারা এই সব জিনিস করেন, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনার জন্যে কেন তা করবেন না? সাধারণভাবে আমি কোন বিক্ষোভেরই পক্ষপাতী নই, কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। একমাত্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত; তার উৎপাদনকারীরা ধ্বংস হয়েছে; তার কাঁচা মালের উপর চাপানো হয়েছে

অপরিমিত শুল্কভার, ইংরেজ শিল্পোৎপাদকদের পণ্যদ্রব্য শুল্কমুক্ত করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার উপর। ন্যায়ের কোন বালাই এতে নেই, এবং একে সহ্য করাও উচিত নয়। ভারতবর্ষের সরকার যদি স্বাধীন হত, তাহলে এটা ঘটতে পারত না। আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলির সংস্কার হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু যদি অধ্যবসায় সহকারে চাওয়া না হয় এবং উচ্চকণ্ঠে দাবি করা না যায়, তাহলে সে সংস্কার সম্ভব নয়।"

সংস্কৃত সাহিত্য—"আপনি যে ভাষায় প্রাচ্য সাহিত্য, এমন কি এর লিপিমালাকে ধ্বংস করা সম্পর্কে ট্রেভেলিঅনের অযৌক্তিক পরিকল্পনার কথা বলেছেন, তা অত্যন্ত সঙ্গত। পরিকল্পনাটি যে অদ্ভুত এবং তাকে কার্যকরী করা যে অসম্ভব, কালক্রমেই তা প্রমাণিত হবে, কিন্তু ইতোমধ্যেই অনেক ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এতে দেশীয় শিক্ষার সমর্থকদের ভাবচিন্তা খণ্ডিত ও ব্যাহত হবে, এবং যেরকম শান্ত ও ভালোভাবে শিক্ষার অগ্রগতি হচ্ছিল, তাতে বিঘ্ন দেখা দেবে। এ দেশীয়েরা তাদের যে-আবেদনে সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র ও মাদ্রাসার বিলোপসাধনের বিরোধিতা করেছেন, তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। তাছাড়া লর্ড উইলিঅমের বিদায়গ্রহণের ফলেও মেসার্স মেকলে ও ট্রেভেলিঅনের অনিষ্টকর অভিসন্ধিগুলি স্থগিত রয়েছে। যদি শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত হয় এবং সেজন্য আপনাদের কষ্ট ভোগ করতে হয় তাহলে আপনাদের নিজেদেরই দোষ দিতে হবে। এঁদের মতো আমিও ইংরেজীর ব্যাপক প্রসারণের পক্ষপাতী এবং তার সম্প্রসারণের জন্যে আমি যতটা করেছি, এঁরা কোনদিনই তা করতে পারবেন না। এঁরা আবার এ বিষয়ে নিজেদের কৃতিত্ব সম্পর্কে লেখালেখি করেন। আপনি জানেন, আমিও এ বিষয়ে কাজ করেছিলাম, কিন্তু ভারতের ক্ল্যাসিক্যাল ভাষাসমূহ ও ইংরেজী চর্চার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য আমি দেখতে পাইনি। আমি এখনো এই মত পোষণ করি যে, সত্যকার উন্নতি, যাকে বলে লোকের মনের উৎকর্ষ সাধন, তা উভয় শ্রেণীর ভাষার চর্চা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না।"

লর্ড উইলিঅম বেন্টিঙ্ক—"কলেজে লর্ড ও লেডি উইলিঅম বেন্টিঙ্কের সম্মানে আয়োজিত সভাগুলির বিষয় আমি অবহিত আছি। আমি মনে করি, আপনারা তাঁদের গুণ বিচার করতে খুবই ভুল করেছেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আমি দেখতে চাই যে, আমার দেশীয় বন্ধুদের মধ্যে একটি সাধারণভাবের বিকাশ ঘটছে। যদি তারা সাহস সঞ্চয় করে এবং তার চেয়েও বড় কথা সম্মিলিত হয়, তাহলে সরকার অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অল্প বেতনের চাকরি দিয়ে তাদের জন্যে যতটা করতে পারবে তার চাইতে নিজেদের কল্যাণ তারা নিজেরাই বেশি সাধন করতে পারবে।"

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুআরির চিঠিতে ডঃ উইলসন এই রকম লিখেছেন :—

ওরিয়েন্টাল টেক্সট সোসাইটি—"আপনার পত্রে লিখিত বিষয়টি আমি কমিটিকে এখনও জানানোর সুযোগ পাইনি। কেননা সভাপতি সার্ গোর আউসলে বাইরে যাওয়ায় কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা যখন মিলিত হব, তখন আপনার বদান্যতার কথা তাঁদের জানাব। তাঁদের ভালভাবে অনুরোধ করব, যাতে তাঁরা আপনাকে তাঁদের কলকাতার প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচন করেন এবং চাঁদা সংগ্রহের ও আপনার ধারণায় যা সুবিধাজনক সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেন। মিঃ মিলেটের সঙ্গে কি আপনার ঘনিষ্ঠতা আছে? সম্প্রতি তিনি বেদগ্রন্থ মুদ্রণের ব্যাপারে মিঃ বেলিকে লিখেছেন এবং এই বিষয়ে মহৎ ও উদার উদ্যম দেখিয়েছেন।"

মুদ্রাতত্ত্ব—"আমি লণ্ডনের নিউমিস্‌ম্যাটিক সোসাইটির জন্যে একপ্রস্থ দেশীয় (খাঁটি দেশীয়) মুদ্রা তৈরির যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে চাই। ইংরেজদের কথা শোনা যায়নি এমন সময়ে ভারতবর্ষের টাঁকশালে যে-ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত, সেগুলিই আমার দরকার। আমার বিশ্বাস, মধ্যভারতের কোন কোন অঞ্চলে অথবা সম্ভবত

লক্ষ্ণৌতেও এই ধরনের জিনিস এখনও ব্যবহৃত হয়। বিশেষত যে নেহাই আর হাতুড়ির সাহায্যে ছাঁচে-ফেলা মুদ্রা তৈরি করা হয়, সেগুলি আমার দরকার; তবে ছাঁচেরই সোজা আর উল্টো পিঠ যদি জোগাড় করে দিতে পারেন তবে আরো ভালো হয়। ধাতু ঢালাইয়ের জন্যে ব্যবহৃত মাটির ছাঁচ, লম্বা হাতা, ওজনের সাধারণ দাঁড়িপাল্লা বা নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতিরও আমার প্রয়োজন। কিন্তু এগুলি খাঁটি ভারতীয় হওয়া চাই, ইওরোপীয় হলে চলবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রীক ও রোমানদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলির সঙ্গে ভারতীয় যন্ত্রপাতির প্রভূত সাদৃশ্য দেখা যাবে। এই যন্ত্রপাতিগুলি প্রাচীন জাতির মুদ্রার উপর যতটা আলোকপাত করবে, প্রাচীনতা বিষয়ে একশটি বক্তৃতা দিয়েও তা সম্ভব হবে না।”

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় দেশীয় হাসপাতালের পরিচালকদের কাছে লিখিত এক পত্রে ডঃ মার্টিন নেটিভ টাউনের মধ্যভাগে একটি ফিভার হসপিট্যাল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ ভাবে জোর দেন। বিষয়টি বিবেচনার জন্য পরিচালকেরা মিলিত হন এবং এ সম্পর্কে যাঁরা তাঁদের টীকা এবং মন্তব্য পেশ করেন, তাঁদের মধ্যে রামকমল অন্যতম। তিনি শুধু স্বাস্থ্যবিজ্ঞানেই তাঁর জ্ঞান দেখাননি, এমন উদার মতও প্রকাশ করেছিলেন, যা তাঁর মতো একজন গোঁড়া হিন্দুর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত; তিনি গঙ্গার পবিত্র জলের দোষ ধরতে দ্বিধা করেননি, মানবতার বিচারে অন্তর্জলী অনুষ্ঠানের নিন্দা করতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। পরবর্তীকালে কলকাতায় স্বাস্থ্যহিতসম্পর্কে যে ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয়েছিল, তাঁর টীকাগুলি তাদের খসড়া বলে মনে করা যেতে পারে।

পরিচালকেরা প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। জনসাধারণের সভা অনুষ্ঠিত হয়, চাঁদা তোলা হয় এবং ডঃ মার্টিন এবিষয়ে গভর্নর জেনারেলের কাছে লেখেন। বাঙলাদেশের সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি গঠিত হয়েছিল সার্ এডওয়ার্ড রায়ন, সার্ জন গ্রাণ্ট, ডঃ মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্যকে নিয়ে এবং রামকমলও এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। যে বিষয়গুলি নিয়ে অনুসন্ধান চলেছিল, তাদের পরিধি ছিল বিস্তৃত এবং সবগুলিই ছিল স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং দরকারী আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পর্কে। কমিটি যেসব অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ানুসারে তা বিভক্ত ছিল এবং এই সব অনুসন্ধানের ফলেই পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা, জল সরবরাহ ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্কারের উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। এগুলির জন্যই এখন শহরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান হয়েছে। সার্ পিটার গ্রাণ্ট ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। এই কমিটির বিবরণীতে লিপিবদ্ধ রামকমল সেন ও ডঃ জ্যাকসনের টীকা ও মন্তব্য নিম্নরূপ :—

"যত রকমের দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে তাদের মধ্যে দরিদ্র ও রুগ্ন লোকেদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ও কল্যাণপ্রদ। বিশেষ করে, কলকাতার মতো মহানগর, যেখানে দেশের সব অঞ্চল থেকে লোক আশ্রয় নেয় তার পক্ষে এ কথা আরো ভালোভাবে প্রযোজ্য।

ইওরোপীয়দের চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য একটি সাধারণ হাসপাতাল, একটি আরোগ্যাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। কিন্তু কলকাতা শহরের মধ্যে ও আশেপাশে অসংখ্য দরিদ্র, গৃহহারা ও সহায়হীন

দেশীয় অধিবাসীদের কিংবা দেশান্তরে যেতে চায় এমন লোকেদের যথেষ্ট উপকারে লাগবার মতো কোন প্রতিষ্ঠান নেই। একটি দেশীয় হাসপাতাল ও দু'টি সাধারণ ঔষধাগার যে আছে সে কথা অবশ্য বলা যায়, কিন্তু সাধারণ লোকেরা এই সব প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সাধারণত নেয় না।

যারা নিজেরা ঔষধাগারে গিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সার্জন অথবা ঔষধ প্রস্তুতকারীর কাছে নিজেদের দেখাতে পারে তাদের ঔষধাগার থেকে ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট মাত্রার ওষুধ খেয়েও যদি রোগ আশানুরূপ ভালো না হয়, কিংবা রোগীর মধ্যে সে ওষুধের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহলে আর ওষুধের জন্যে তারা ঔষধাগারে হাজিরও হয় না, আবেদনও করে না। তারপর তাদের কি হল তা জানাও যায় না। তাছাড়া এমন অনেক লোকও আছে যারা ঔষধাগার থেকে ওষুধ নেয়, কিন্তু খায় না। নেটিভ হাসপাতাল একদিক থেকে খুবই উপযোগী। বাহ্যিক বা দুর্ঘটনাজনিত আঘাত থেকে যারা যন্ত্রণা ভোগ করত, তাদের জন্যে এটি প্রথমে স্থাপিত হয়েছিল, পুলিস এধরনের রোগী অনবরত পাঠাত এই হাসপাতালে। কিন্তু জ্বর বা অন্য রোগে আক্রান্তদের খুব কমই উপকারে আসে এই হাসপাতালটি। প্রতি বৎসর এরকম রোগী বহু মারা যায়। কিন্তু তারা কেন এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ তা বোঝা যাবে তাদের অভ্যাস, রীতি ও ধর্মীয় সংস্কার বিচার করলে। এই হাসপাতালে সব শ্রেণী ও জাতির রোগীদের কোন ভেদাভেদ না রেখে ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না করে ভর্তি করা হয়; তাই রোগীরা বরং নিজেদের চালা ঘরে বা কুটিরে পড়ে মরে, কিন্তু এই হাসপাতালের সুবিধা গ্রহণ করে না। এই সব লোকেদের সাহায্যের জন্যে যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়, তাই হল এই স্বল্প কয়েকটি টীকার উদ্দেশ্য।

কলকাতার মধ্যে এবং তার আশেপাশে যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব, জ্বর নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল। ডঃ মার্টিন তাঁর টীকায় সঙ্গে এর কারণ সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তা অত্যন্ত যথার্থ। নিম্নলিখিত গুলিকে জ্বরের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় :—

প্রথম—নেটিভ টাউনের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর পানীয় জল সরবরাহের দিঘির অভাব।

দ্বিতীয়—আবর্জনায় ভর্তি বদ্ধ জল।

তৃতীয়—অস্বাস্থ্যকর জলের অগভীর ডোবা।

চতুর্থ—খানা-গর্ত খুঁড়ে সেগুলি না বুজিয়ে খুলে রাখা।

পঞ্চম—পয়ঃপ্রণালীর অব্যবস্থা।

১ ॥ এদেশীয় লোকেরা কলকাতায় ভাল দিঘির অভাব গভীরভাবে অনুভব করেন। জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী কয়েকটি দিঘি শহরে আছে,—

লালদিঘি,
ওয়েলিংটন স্কোয়ার,
পটলডাঙা, ও
হেদুয়া

এগুলির মধ্যে প্রথমটি সকাল ছটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত লোকে ভর্তি থাকে। নদীর সঙ্গে যদি যোগ না থাকত তাহলে প্রতি বছর এপ্রিল-মে'র মধ্যে এটি শুকিয়ে যেত।

দ্বিতীয়টির জলও খুব ভাল বলা চলে না।

তৃতীয়টি অগভীর এবং শুকনো ঋতুতে এতে যে সামান্য জল থাকে তা সাধারণ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগী নয়। তাছাড়া সাধারণ পয়ঃপ্রণালীর জলে প্রায়ই ভর্তি হয়ে যাওয়ার ফলে এর জলও দূষিত।

চতুর্থটির জল খুব কমই ব্যবহৃত হয়—এর কারণ কি জানি না।

নদীর জল যে বৎসরের অধিকাংশ সময়েই অস্বাস্থ্যকর এবং নোংরা অবস্থায় থাকে, সে কথা আর বলার দরকার নেই, কারণ অনেকেই

তা জানেন। প্রকৃত জলাশয়ের অভাবে গরীব লোকেরা বাধ্য হয়ে যে জল সুবিধামতো হাতের কাছে পায়, তাই ব্যবহার করে।

২॥ নদীতে ও সার্কুলার খালে বর্ষার জল বয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে কলকাতার পয়ঃপ্রণালীগুলি মন্দ নয়, কিন্তু শহরের অধিকাংশ জায়গায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীগুলির অবস্থা অত্যন্ত বিরক্তিজনক। রান্নাঘর ইত্যাদি থেকে নির্গত যে-জল বদ্ধ ও জমা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে এই পয়ঃপ্রণালীগুলির কোন যোগ নেই।

৩॥ শহরের মধ্যে অনেকগুলি অগভীর দিঘি আছে। এগুলিতে খুব কম জল থাকে এবং বৎসরের অধিকাংশ সময়েই সে জল নিকৃষ্ট রকমের। এগুলিতে যে দূষিত বায়ু সৃষ্টি হয়, তাতে দিঘিগুলির আশেপাশে যাঁরা যাতায়াত বা বসবাস করেন, তাঁদের পীড়িত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। রাস্তার যে সমস্ত দূষিত আবর্জনা বা ময়লা জমা হয়, অনেকে সেই সব সংগ্রহ করে এদের অনেকগুলি ভর্তি করে দেয়। এই সব দিঘির আশেপাশে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের দুর্দশা বা বিরক্তির কথা গ্রাহ্য না করেই এই সব লোকেরা ময়লা ফেলে। এইরকম কয়েকটি ভর্তি হতে এক বা দু'বছর সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে নিকটবর্তী দিঘি ও কূপের জল দূষিত বা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যেতে পারে। এর ফলে ঐ অঞ্চলের আশেপাশে বায়ুও যে কতটা দূষিত হয়, তা অবশ্য আমি বলতে পারি না। এরকম সময়ে এই ধরনের একটা জায়গার কাছাকাছি বাস করার চাইতে মনোভাবের পক্ষে বেশি ক্ষতিকর বা বিরক্তিদায়ক আর কিছু থাকতে পারে না।

৪॥ কুঁড়ে ঘরের মেঝে উঁচু করার জন্যে বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে লোকে গর্ত বা খাদ খোঁড়ে; তারপর সেগুলি খোলা রেখে দেয় কিংবা কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে আবর্জনা ও ময়লা দিয়ে অর্ধেক বুজিয়ে ফেলার অনুমতি পায়। পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা বা পরিবেশ, এই দুইদিক দিয়েই এই প্রথা গুরুতর ক্ষতির প্রধান কারণ।

৫ ॥ আমি বলেছি যে পয়ঃপ্রণালীগুলির অবস্থা মোটামুটি ভাল, কিন্তু যতদিন ব্যক্তিগত 'টাট্টি' বা 'পায়খানা'গুলিকে এদের দুদিকের পাড়ে রাখতে দেওয়া হবে, ততদিন অধিবাসীদের বিশেষ কিছু ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কম। এতে মাঝখানকার জিনিস জমা হয়, এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আবার এই সমস্ত জিনিস একই পয়ঃপ্রণালীগুলিতে বর্ষার জলে ধুয়ে যাবার জন্যে ফেলা হয়।

কলকাতার উপকণ্ঠে পয়ঃপ্রণালীগুলির অবস্থা বেশ খারাপ। এগুলিতে জল অবাধে যেতে পারে না। জঙ্গলে ঘেরা জলাজায়গায় বা জনাকীর্ণ বাগানগুলিতে বাতাস পর্যন্ত ভালোভাবে চলাচল করতে পারে না। এই অবস্থায় বদ্ধ জলে গাছপালা পচে ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয় এবং জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। আমি দেখেছি যে শ্রমিক, কৃষক ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে খুব কমই এর প্রকোপ এড়াতে পারে; অবশ্য উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও যে অনেকে এতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় না, তা নয়।

যারা গায়ে ঢাকা দেওয়া বা উঁচু বিছানা ইত্যাদি প্রতিরোধক কিছুর ব্যবস্থাই করতে পারে না, বাধ্য হয়ে রসালো উদ্ভিজ্জ খায় আর স্যাঁতসেতে জায়গায় শোয়, খালি পা আর খালি মাথায় থাকে, তাদেরই বেশি ভুগতে হয়। এদের জ্বর প্রায়ই ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়, কোন কোন জায়গায় শেষপর্যন্ত মহামারীর আকার ধারণ করে।

বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকেরা কলকাতায় আসে চাকরির খোঁজ করতে, কেউবা আসে বন্ধু ও পরিচিতদের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইতে, কেউ আবার আসে ঝুঁকিদার ব্যবসার ফিকিরে। যাদের আশ্রয়ে তারা আসে, তাদের অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়—কেউ অফিসে কাজ করে, কেউ অন্য ধরনের কাজে নিযুক্ত, কেউ কেউ আবার ভৃত্যের কাজও করে। এদের মধ্যে যারা স্বতন্ত্রভাবে থাকতে চায়, তারা কুঁড়েঘর কিংবা পুরনো বাড়ি ভাড়া নেয়। এখানকার ছোট ছোট ঘরগুলির ভাড়া মাসে দু'আনা থেকে দু'টাকা পর্যন্ত। এই সব লোকদের

পর্যাপ্ত কাপড় জামা নেই, অধিকাংশ সময়েই এরা প্রায় উলঙ্গ থাকে। এর ওপর তাদের বিছানাও নেই—ছোটঘরে, যাকে গর্তও বলা চলে; স্যাঁতসেতে মেঝের উপর মাদুর বা পাতা বিছিয়ে শুয়ে থাকে। আবার গরমকালে তারা খোলা জায়গায় কিংবা রাস্তার পাশে শোয়। আবহাওয়া বা অন্যান্য পরিবর্তনের প্রভাব এড়িয়ে নিজেদের রক্ষা করার সামর্থ্য তাদের নেই।

যখন জ্বর বা কলেরা হয় তখন তাদের দেখাশুনার কেউ থাকে না। উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার, কাপড়জামা বা খাদ্য ও পথ্য সংগ্রহের কোন সঙ্গতি তাদের থাকে না। যদি তারা জ্বরে আক্রান্ত হয়, তাহলে সে জ্বর বাড়তেই থাকে, আর দিনে দিনে তা প্রবল আকার ধারণ করে। মাত্র এক পয়সা দামের এক মাত্রা পাঁচন*ও অনেকে কিনতে পারে না। বাড়ির লোকেদের বা তাদের প্রতিবেশীদের যদি কেউ ওষুধ কেনার পয়সাও দেয়, তাহলেও সে ওষুধ তৈরি করার মতো জায়গা বা সঙ্গতি তাদের নেই; জীবনের সব স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে তাদের রোগ এমন সঙ্কটজনক একটা অবস্থায় এসে পেঁছায় যে আরোগ্যের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। এই রকম অবস্থাতেও তারা কারো কাছ থেকে যত্ন বা মনোযোগ পায় না; আবহাওয়ার পরিবর্তনের মধ্যেও নিজেদের রক্ষা করার মতো কিছুই তাদের থাকে না, পানের জন্যে অস্বাস্থ্যকর জল ছাড়া আর কিছু জোটে না তাদের।

এই সব দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের আশ্রয়দাতা বন্ধুরা কিংবা বাড়িওয়ালারা তাদের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে চিকিৎসা সম্পর্কে নির্দেশ পাবার জন্যে বৈদ্য† ডেকে পাঠায়। অন্য নানা ঝামেলায় জড়িত হয়ে পড়তে হয় বলে বাড়িওয়ালা বা আশ্রয়দাতা

* সবচাইতে সস্তা ও সাধারণ দেশীয় ওষুধ।

† দেশীয় ডাক্তার।

রুগীকে নিজে দেখতে পারে না। তাছাড়া রুগীর যথাযথ যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা তার থাকে না বা সে করতেও পারে না। তাই এই সব রোগগ্রস্ত ভাড়াটে বা অতিথির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তারা সাধারণত কতকগুলি উপায় অবলম্বন করে। রুগীকে তার দেশে তার পরিবারের লোকের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে হয় একটা নৌকো, না হয় একটা ডুলি ভাড়া করে। রুগী আপন দেশে খুব কম ক্ষেত্রেই গিয়ে পৌঁছোয়। (প্রতিকূল) আবহাওয়ার মধ্যে অরক্ষিত, দুর্বল অবস্থায় তাকে যে ঝাঁকানি ও উত্তেজনা সহ্য করতে হয়, তাতে শীঘ্রই সে ইহলোক ত্যাগ করে। আমি প্রায়ই দেখেছি মাঝি বা বাহককে এই ধরনের রুগীকে 'ঘাটে' বা নদীর পাড়ে রেখে দিতে। সেখানে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা মারা যায়, আর নয়ত মারা যাবার আগেই শিকারী জন্তুরা তাদের আক্রমণ করে। কলকাতায় রুগীদের পরিত্যাগ করার দ্বিতীয় যে উপায়টি আছে, তা আরো সুবিধাজনক। এতে রুগীকে কোন নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে ঘাটের ভাড়া-করা লোকের তত্ত্বাবধানে তাকে রেখে তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা হয়।

মৃত ব্যক্তির এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত লোকের পক্ষে এই উপায়টিই অধিকতর সুবিধাজনক এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ বলে মনে করে। এর আরো একটি কারণ আছে। যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তি মনে করে যে তার বাঁচবার আর কোনো আশাই নেই, তখন সুপরিচিত হিন্দু বিশ্বাসের ফলে তার ধারণা হয় যে, পবিত্র নদীর তীরে মারা যাওয়াই ভাল। রুগীকে তার ঘরে মরতে দেওয়া বা (মারা গেলে) তার দেহকে নদীতে নিক্ষেপ করা মৃতের বংশধর ও বন্ধু, উভয়ের কাছেই গভীর লজ্জা ও কলঙ্কের ব্যাপার, কারণ যাদের সঙ্গে সে বাস করেছে এ কাজ তাদের পক্ষেও নিষ্ঠুর ও অনুচিত বলে ধরা হয়। কিন্তু সে যদি গঙ্গার ধারে মারা যায়, তাহলে তার পরিবারের লোক ও বন্ধুরা অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা পায়। মৃতের

বন্ধুরা যদি মনে করে যে, মরার আগে তার জন্যে যতটা করা সম্ভব তা করা হয়েছে, তাহলে রুগীর বাড়িওয়ালা বা আশ্রয়দাতা অন্তত নিন্দাবাদের হাত থেকে রক্ষা পায়। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, যারা মুমূর্ষুকে ওষুধ দিয়েছে, খাদ্য জুগিয়েছে এবং তার প্রয়োজনীয় শেষ কাজ করেছে, তারা তার কাছ থেকে জোর করে সম্পত্তি কেড়ে নেবে না। কিন্তু রুগীর বন্ধুরা বা তার বাড়িওয়ালা যদি তাকে তার ঘরে মরতে দেয় তাহলে তাদের পুলিসের ঝামেলা পোহাবার ভয় আছে। পুলিস মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে এসে মৃত দেহ সরানোর অনুমতি দেবার আগে খোঁজ করে সে কোন সম্পত্তি রেখে গেছে কিনা। অনর্থক ঝামেলা বা অর্থব্যয় ছাড়া পুলিসের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সব সময় সহজ নয়। তাছাড়া তার নিজের জাতের লোক ছাড়া আর কেউ মৃতদেহ ছুঁতে পারে না, ছোঁয়ও না। সুতরাং মৃতদেহ পড়েই থাকে। এই সব অবস্থা থেকেই 'অন্তর্জলী' বা 'ঘাটহত্যা' প্রথার উদ্ভব হয়েছে। সম্প্রতি আবার কলকাতার কাগজগুলোতে এই নিয়ে খুব লেখালেখি হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এইসব লোকেরা বর্তমানে যে-চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি রয়েছে সেখানে চিকিৎসার জন্যে উপস্থিত হতে পারে না। এদের বাঁচানোর জন্যে নেটিভ টাউনের মাঝখানে একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব বহুদিন ধরে অনুভূত হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠান বলতে আমি বোঝাচ্ছি গৃহহীন, বন্ধুহীন ও রোগগ্রস্তদের দেশীয় লোকেদের জন্যে একটি মাঝামাঝি ধরনের হাসপাতাল, যেখানে তারা সাধারণ চিকিৎসা ও আদরযত্ন পাবে এবং আরোগ্যলাভের সময় যেখানে তাদের একটা অস্থায়ী আশ্রয় মিলবে।

সংস্কৃত কলেজের চিকিৎসা বিভাগের সঙ্গে যে হাসপাতালটি সংযুক্ত ছিল, সম্প্রতি নূতন চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে সরকারের আদেশে সেটিকে তুলে দেওয়া হয়েছে। সমিতি সঙ্গতি সত্ত্বেও যথেষ্ট কল্যাণ-

সাধন করেছিল এই হাসপাতালটি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান যদি স্থাপিত হয় যার আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি হবে রুগীদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংস্কারকে আঘাত না করা তাহলে তা হবে খুবই কল্যাণপ্রদ এবং জনসাধারণ সেটিকে আশীর্বাদ বলেই গণ্য করবে। গোড়ার দিকে এর জন্যে ব্যয় হবে সামান্য; তার পর শহরের গণ্যমান্য হিন্দু অধিবাসীরা যখন হাসপাতালের আদর্শ জানতে পারবে এবং এখানে সম্পাদিত শুভকাজের পরিমাণ বুঝতে সক্ষম হবে তখন তারা মুক্ত হস্তে দান করার বা চাঁদা দেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসবে। হাসপাতালের শৃঙ্খলা সম্পর্কে এদেশীয়দের, বিশেষ করে হিন্দুদের মনোভাব এবং আমাদের চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানে বর্তমানে তাদের বিরাগের কারণ সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহে রামকমল সেন আমাকে দ্রুত ও মূল্যবান সাহায্য দান করেছেন। সেইজন্যে তাঁকে আমার সবচেয়ে বেশী ধন্যবাদ না জানিয়ে আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করতে পারি না। তিনি এতো সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাজ করেছেন যে তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যকে বিন্যস্ত ও একত্র করতে আমাকে খুবই কম খাটতে হয়েছে। তাঁর টীকা ও মন্তব্যগুলি শহর সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিচায়ক এবং এগুলিতে অসুস্থকে সারিয়ে তোলা ও সাহায্য করার ব্যাপারে তাঁর কল্যাণকর ইচ্ছার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।"

এ. আর. জ্যাকসন

মিউনিসিপ্যাল কমিটির সামনে রামকমল সেন যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা এইরূপ ঃ—

"প্র. ১—বিগত অগ্নিকাণ্ডগুলির ফলে কলকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়েছে এবং গভর্নর জেনারেল এই বিষয়ে আমাদের একটি বিবরণী দাখিল করতে বলেছেন। মনে হয় যে, দরমার দেওয়াল ও খড়ের চালের জায়গায় আইন দিয়ে মাটির দেওয়াল ও টালির ছাদের কুটির নির্মাণে লোকদের বাধ্য করার ব্যাপারে প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের

কিছু আপত্তি আছে। এই দুই ধরনের কুটির তৈরিতে দামের তফাত কত হয় বলে আপনার ধারণা ?

উ.—মাটির দেওয়াল-দেওয়া কুটির আছে তিন রকমের। প্রথমটিতে মাটির দেওয়াল ভিত থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে একেবারে ছাপ্পর (খোলার চাল) পর্যন্ত উঠে গেছে। এধরনের দেওয়াল অবশ্য কলকাতায় তৈরি করা যায় না, কারণ কলকাতার মাটি এর উপযোগী নয়। দ্বিতীয়টি—মাটি-মাখা বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরী ছিটাবেড়া। মফঃস্বলের তুলনায় কলকাতায় স্যাঁতসেতে ভাব বেশী বলে এটিও এখানে ব্যবহার করা চলে না। তৃতীয়টি—গোবর ও মাটি-মাখা গরানের দণ্ড দিয়ে তৈরী। এই ধরনের জিনিসেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে আরো ভালোভাবে, এগুলি টিকবেও বেশী এবং আগুনেও সহজে পুড়বে না। সেদিক দিয়ে তুলনা করলে খরচও খুব বেশী পড়বে না, টালির দামেই যা শুধু তফাত রয়েছে। আগে খড় খুব সস্তা ছিল, এখন তা খুব দুর্মূল্য। সেই জন্যে লোকে কুটির নির্মাণের জন্যে বিচালি বলে এক ধরনের সাধারণ খড় ব্যবহার করে। এটা মাত্র বছরখানেক টেকে। কাঠামো তৈরির ব্যাপারে একটা মাত্র তফাত হচ্ছে এই যে, টালি-দেওয়া কুটিরের কাঠামো বেশী শক্ত আর ঘন করা দরকার। এই সব দণ্ড আর টালি ব্যবহার করলে ৩০-৪০ বছর টিকতে পারে। সুতরাং আরম্ভে খরচ বেশী হলেও, পরিণামে এগুলি সস্তা। কিন্তু কুটির নির্মাণের যা খরচ তার জন্যে নগদ টাকা জোগাড়ের অসুবিধা আছে।

প্র. ২—এগুলিতে খরচ কত পড়ে ?

উ.—যে ধরনের কুটির নির্মিত হবে তার উপরই নিশ্চয় এটা নির্ভর করে। বারো আনা থেকে শুরু করে পাঁচটাকা-দশটাকা দামের ছাপ্পর আছে। সব টাকাই এক সঙ্গে মিটিয়ে দিতে হয়। ভালো ধরনের কুটির নির্মাণ করতে গেলে সময়ও লাগে বেশী। সব সময় আবার টালি পাওয়াও যায় না এখানে, ব্যারাকপুর ইত্যাদি জায়গা থেকে আমদানি করতে হয়।

প্র. ৩—সমান আকারের টালির আর খড়ের কুটিরের মধ্যে দামের প্রভেদ কত বলে আপনার মনে হয় ?

উ.—খড় আর টালির দামের যত প্রভেদ। শক্ত টেকসই খড়ের কুটির আর টালির কুটিরের মধ্যে দামের প্রভেদ হচ্ছে শতকরা ৫০ ভাগ, তার মানে, একটির দাম যদি হয় ১০ টাকা আর একটির হবে ১৫ টাকা। দরমা ও দণ্ড বারোমাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়।

প্র. ৪—সুবিধা, স্বাস্থ্য বা পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে দেশীয়েরা কোনটিকে বেশী পছন্দ করে ? এবিষয়ে তাদের কি কোন সংস্কার আছে ?

উ.—সামর্থ্য থাকলে তারা টালির কুটিরই তৈরি করত। অপরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি নেই। এই সব কুটিরে যারা বাস করে, তারা ময়লাকে গ্রাহ্য করে না। আমার মনে হয়, তারা সকলেই টালির কুটির বেশী পছন্দ করে। যারা ঐসব কুটিরে থাকে তারা দিনের বেশির ভাগ সময়ই বাইরে থাকে ; তাছাড়া গরমকেও তারা গ্রাহ্য করে না। খরচার তফাত ছাড়া তাদের আর কোন সংস্কার বা মনোভাব নেই। ঠিক মতো ছাওয়া হলে খড়ের কুটির টালির কুটিরের চেয়ে বেশী শীতল হয়। বৃষ্টি, ঠাণ্ডা আর ধুলোর হাত থেকে এগুলিতে রেহাই পাওয়া যায়। তবে এগুলিতে আগুন লাগবার সম্ভাবনা বেশী।

প্র. ৫—তাহলে আপনার ধারণা যে একমাত্র খরচের ওপরেই লোকের পছন্দ নির্ভর করে ?

উ.—নিশ্চয়ই ; আমি মনে করি টালির কুটিরের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। আগে শহরের মোট কুটিরের তিনের চারভাগ ছিল খড়ের তৈরী, এখন অর্ধেকের বেশী টালির তৈরী।

প্র. ৬—জমিদার ও বাসিন্দাদের তৈরী কুটিরের সংখ্যার অনুপাত কি আপনি জানেন ?

উ.—তিন শ্রেণীর কুটির আছে। প্রথম শ্রেণীর কুটির হল জমিদারদের তৈরী। খাজনার পরিবর্তে জমি নিয়ে একদল লোক

ভাড়া দেবার জন্যে কুটির তৈরি করে ; এগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর কুটির। অল্প মূল্যে জমি ভাড়া নিয়ে রায়ত প্রজারা নিজেদেরই ব্যয়ে যে কুটিরগুলি তৈরি করে সেগুলি হল তৃতীয় শ্রেণীর। এই তৃতীয় শ্রেণীর কুটিরের অনুপাতই সবচেয়ে বেশী—অর্ধেকেরও বেশী, আমার ধারণা তিনভাগের দু'ভাগ।

প্র. ৭—তাহলে বাধ্যতামূলক আইনে কুটির তৈরির খরচ কি যারা বেশী গরীব তাদের ওপর পড়বে ?

উ.—নিশ্চয়ই তাই হবে। যারা বেশী ধনী তাদের ওপর না পড়ে অপেক্ষাকৃত গরীব ভাড়াটেদের ওপর এটি পড়বে এবং এটি একটি জবরদস্তির ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াবে।

প্র. ৮—আপনার কি মনে হয় দেশীয়দের মনোভাব এ ধরনের আইনের প্রতিকূল ?

উ.—যাদের সঙ্গতি আছে তাদের নয়, কারণ তারা কুটির তৈরি করবে। যারা অপেক্ষাকৃত গরীব, তারা কলকাতা ছেড়ে শহরতলি বা অন্য জায়গায় চলে যাবে।

প্র. ৯—তাহলে জমির মালিকদের ভাড়ার ক্ষতি হবে না ?

উ.—আমার মনে হয়, এই ক্ষতি হবে সাময়িক। তারা আবার ফিরে আসবে এবং যখন সামর্থ্যে কুলোবে তখন কলকাতায় কুটির তৈরি করবে।

প্র. ১০—আপনি কি মনে করেন যে আলোচ্য আইনটি বিধিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত ?

উ.—আমার ধারণা, এই আইন যদি সাধারণভাবে বিধিবদ্ধ হয়, তাহলে যেসব গরীব লোকের এই খরচ করার সঙ্গতি নেই, তাদের কাছে এটা খুবই কঠোর হবে। তবে আংশিকভাবে বিধিবদ্ধ হলে সে ভয় থাকবে না। আমি বলতে চাই—যে অঞ্চলে পাকা বাড়ি বা টালির বাড়ি নির্মাণের সম্ভাবনা থাকবে, সে অঞ্চলে খড়ের কুটির তৈরি নিষিদ্ধ করতে হবে।

প্র. ১১—খড়ের কুটির কাছে থাকলে পাকা বাড়ি নষ্ট হয়, খড়ের কুটির সম্পর্কে এ অভিযোগ কি ঠিক নয় ?

উ.—হ্যাঁ, ঠিক। সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে যত পাকাবাড়ি নষ্ট হয়েছে, তত আর কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা ছিল না। আমি এই ধরনের কুটিরের কাছে পাকা বাড়ি তৈরি করব না। .

প্র. ১২—দরিদ্রেরা শহরতলিতে অপেক্ষাকৃত সস্তায় কুটির তৈরি করতে পারবে বলে সেখানে চলে যাবে ; এর জন্যে কি জমির মালিকেরা টালির বাড়ি তৈরিই করবে না ?

উ.—হ্যাঁ, গরীবেরা শহরতলিতে চলে যাবে, কারণ অপেক্ষাকৃত সস্তায় তারা কুটির নির্মাণ করতে পারবে। যদি এমন কোন আইন প্রচলিত হয়, যাতে জমির মালিকেরা সবচেয়ে জনাকীর্ণ অঞ্চলে, যেমন সাধারণ রাস্তার ধারে, বাজার ইত্যাদিতে টালির বাড়ি তৈরি করে সুবিধা অনুযায়ী ভাড়া দেবে, তাহলে আমার মনে হয় শহরতলিতে তারা টালির বাড়ি তৈরির জন্যে অর্থ ব্যয় না করে কেবল খড়ের কুটির নির্মাণ করবে এবং এইভাবে অনিষ্টের সম্ভাবনাকে শুধু শহর-তলিতে সরিয়ে দেওয়া হবে।

প্র. ১৩—আমরা জানতে চাই যখন জমির মালিক দেখবে রায়তেরা তার জমি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন সে টালির বাড়ি তৈরি করবে কি না ?

উ.—আমি তো করব না। আমার যদি কোন জমি থাকে তাহলে আমি তার ওপর নিজে বাড়ি তৈরি না করে, রায়তদের সেটি ভাড়া দিয়ে দেব, যাতে তারা নিজেরাই বাড়ি তৈরি করে নেয়। তার কারণ, ভাড়া বাড়িতে রায়তদের কোন আকর্ষণ থাকে না ; তারা প্রায়ই পালিয়ে যায় আর ভাড়াটাও নষ্ট হয়।

প্র. ১৪—এই ধরনের আইন প্রণয়ন যুক্তিযুক্ত কি না, সে সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন।

উ.—আংশিকভাবে এ আইন প্রবর্তন করা যুক্তিযুক্ত। এতে শহরকে কতকগুলি অঞ্চলে ভাগ করতে হবে এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করতে হবে। কোনো বিশেষ অঞ্চলে খড়ের কুটির নির্মাণ করা যাবে কি না তা স্থির করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এই কমিটির থাকবে। আঞ্চলিক কমিটির আইনগত অনুমতি ছাড়া কোন কুটির নির্মিত হতে পারবে না। কিন্তু খড়ের কুটির তৈরি নিষিদ্ধ করার জন্যে কোন সাধারণ আইন জারি হলে তা খুবই কঠোর হবে। বামুন বস্তির মতো যেসব জায়গায় কোন পাকাবাড়ি নেই, সেখানে এ আইনের ফল হবে দুঃসহ; রায়তেরা এতে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে শুরু করবে।

প্র. ১৫—তাহলে আপনি মনে করেন যে কমিটির অধীনে আংশিক নিয়ন্ত্রণই যুক্তিযুক্ত?

উ.—হ্যাঁ, যেখানে পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুযায়ী নিষিদ্ধীকরণ যুক্তিসঙ্গত নয়।

প্র. ১৬—কি করে এইসব কমিটি তাদের বিচারশক্তি প্রয়োগ করবে?

উ.—কমিটিগুলি পুলিসের কর্তৃত্বাধীনে কাজ করবে।

প্র. ১৭—এর ফলে কি অসুবিধার সৃষ্টি হবে না? কমিটিগুলির তাহলে করার কি থাকবে?

উ.—কমিটিগুলির কর্মক্ষমতা হবে সরকারের অধীন। যেখানে কিছু টালির কুটির বা পাকাবাড়ি আছে সেখানে তারা খড়ের কুটির তৈরি করতে দেবে না। তাছাড়া আগুন লাগলে যেদিক দিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা, সেদিকেও খড়ের কুটির তৈরি করা তারা নিষিদ্ধ করবে। কমিটিগুলির অধিকার নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমিত থাকবে বলে তারা নিজেদের স্বার্থ জানবে আর সেই ভাবে কাজ করবে।

প্র. ১৮—তাহলে আপনার মত সাধারণ বাধ্যতামূলক আইনের বিরুদ্ধে, কিন্তু আপনি অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত কমিটির হাতে নিষিদ্ধীকরণের ক্ষমতা দিতে চান?

উ.—হ্যাঁ।

প্র. ১৯—সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে কি পরিমাণ ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তা কি আপনি জানেন ?

উ.—এ নিয়ে ঠিক করে বলা অসম্ভব, তবে আমার মনে হয় কাগজে এ সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্কে সম্পত্তি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া

প্র. ২০—প্রত্যেকটি পরিবারের গড়পড়তা ক্ষতির পরিমাণ কত বলে আপনার আন্দাজ ?

উ.—আমার মনে হয়, প্রত্যেক পরিবারের অন্তত ২০ থেকে ৩০ টাকা ক্ষতি হয়েছে—এটা বোধ হয় বেশি হল ; আমার অনুমান, কুটিরের দাম ছাড়া সবচেয়ে বেশী ক্ষতির পরিমাণ ১০ টাকা।

প্র. ২১—অগ্নিকাণ্ডের ফলে যারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে তাদের দুঃখ দূর করার জন্যে চাঁদা দিয়ে টাকা তোলার একটি প্রস্তাব ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির কমিটির কাছে এসেছে। ধরুন, কমিটি যদি মোটা টাকা তোলে এবং সে টাকা ঠিকমতো বিলি হয় তাহলে কি কোন বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে ?

উ.—আমার মনে হয় না যে চাঁদা এত উঠবে যা দিয়ে সব লোককে টালির কুটির নির্মাণে সাহায্য করা যেতে পারে।

প্র. ২২—ধরুন, ৩০,০০০ টাকার মতো চাঁদা উঠল।

উ.—আমার মনে হয় না যে ঐ পরিমাণ চাঁদা উঠবে ; যদি ওঠে তাহলে কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলের লোকেদেরও টালির কুটির তৈরিতে সাহায্য করতে পারবেন। যতদিন না সমস্ত কুটির টালির হচ্ছে অর্থাৎ আগুনে পোড়া কুটিরগুলির পুনর্নির্মাণ হচ্ছে আর বাকি খড়ের কুটিরগুলিকে টালির কুটিরে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, ততদিন টালির কুটিরে বাস সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হবে না ; বিপদের সম্ভাবনাও একেবারে দূর হবে না।

প্র. ২৩—ধরুন, অসুবিধা দূর হয়েছে। তাহলে কি আপনি বাধ্যতামূলক আইনে সম্মত হবেন ?

উ.—কোনোমতেই নয়। আমি মনে করি, বাধ্যতামূলক কোন আইন কোন অবস্থাতেই প্রবর্তন করা উচিত নয়। বড়লোকেরাও অনেক সময় খড়ের কুটির নির্মাণ করে, কিংবা এমন জিনিস দিয়ে অস্থায়ী বাড়ি তৈরি করে যাতে সহজেই আগুন লাগে। এতে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়।

প্র. ২৪—যে অঞ্চলে টালির বাড়ি নির্মিত হবে সেটি কি বেশী অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে ?

উ.—যথেষ্ট পরিমাণে, যদি একটি বাড়ি অপর বাড়িটি থেকে যথেষ্ট দূরত্বে নির্মিত না হয়। একটি অপরটি থেকে যথেষ্ট দূরত্বে নির্মিত হলে, সেগুলির মধ্যে হাওয়া চলাচলের জায়গা থাকবে; তাছাড়া, বাড়িগুলির জন্যে প্রয়োজনীয় মাটিও সরবরাহ করতে হবে। তা না হলে লোকে গর্ত খুঁড়বে, গর্তগুলি বদ্ধ জলে ভর্তি থাকবে, তার পর আবর্জনা দিয়ে ক্রমে ক্রমে সেগুলি ভর্তি করা হবে।

প্র. ২৫—তাহলে আপনি মনে করেন ভূগর্ভস্থ জলনিষ্কাশনের ও পয়ঃপ্রণালীর যথাযথ ব্যবস্থা না হলে, টালির কুটির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করবে ?

উ.—হ্যাঁ, যদি না গর্ত কাটা বন্ধ করা হয়।

প্র. ২৬—তাহলে বোধহয় শহরকে স্বাস্থ্যকর রাখার জন্যে অগ্নিকাণ্ডের দরকার।

উ.—আমার যদি ভুল না হয়, তাহলে মনে হয় যে-আর্দ্রতায় বাতাস ভর্তি থাকে, অগ্নিকাণ্ডে তা নষ্ট হয় এবং এর ফলে অস্বাস্থ্যকরতা কতক পরিমাণে কমে যায়। আমার যে চিকিৎসক বন্ধু (ডক্টর জ্যাকসন) আমার সামনে বসে আছেন তিনি এ বিষয়ে আমার চেয়ে ভালোভাবে বলতে পারবেন।

প্র. ২৭—ক্যাপ্টেন বার্চ সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন, যাতে জমিদারেরা তাদের নিজেদের জমি ঘর তৈরির উপযোগী করে প্রস্তুত করতে বাধ্য হয়। এ বিষয়ে আপনার কোনো আপত্তি আছে?

উ.—তা নির্ভর করে জমির মূল্যের ওপর। শহরের সব অঞ্চলে অবশ্য এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করা যাবে না। বাসিন্দাদের সুবিধা অনুযায়ী কুটিরগুলি অবশ্যই নির্মিত হবে; কিন্তু এই ধরনের কোন পরিকল্পনা যদি গৃহীত না হয়, তাহলে শহরটি কোন কালেই সৌন্দর্য-সম্পন্ন হতে পারবে না। আমি সন্তুষ্ট থাকব ব্যাপারটি কমিটির ওপর ছেড়ে দিয়ে।

প্র. ২৮—ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির কমিটিতে সংগৃহীত অর্থ দেশীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে দুর্দশাগ্রস্তদের মধ্যে ধার হিসাবে বিতরণ করা হবে; আপনার কি মনে হয় এ কাজে জালজুয়াচুরি হবে না?

উ.—টাকা ধার দেওয়া আমি নিরাপদ বলে মনে করি না। টাকা আপনারা একসঙ্গে চাঁদা হিসাবে দিতে পারেন। এরও কতকগুলি অসুবিধা আছে: এমন অনেক লোক আছে যাদের টালির বাড়ি তৈরি করার সামর্থ্য থাকলেও তা করবে না, কারণ প্রায়ই তারা বাসস্থান পরিবর্তন করে। তাছাড়া কিছু লোক আছে যারা স্থায়ীভাবে এক জায়গায় থাকে না। তারা ভাড়া জমিতে বাস করে, কিন্তু ভাড়া দেয় না; সেই বাকী ভাড়া মেটাতে হবে কুঁড়েঘরগুলির দাম দিয়ে: এইভাবে ঋণটাই আর ফেরত পাওয়া যাবে না।

প্র. ২৯—এর ফলে তারা হয়ত পরের বছর একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে প্রবৃত্ত হবে। পুড়ে-যাওয়া কুটিরগুলির কত অংশ লোকেরা নিজেই তৈরি করে নেবে বলে আপনার মনে হয়?

উ.—প্রায় এক দশমাংশ।

প্র. ৩০—মেডিক্যাল কলেজ কাউন্সিল প্রস্তাব করেছেন যে, মেডিক্যাল কলেজ ও প্রস্তাবিত জ্বরের হাসপাতালটি মিলিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আপনার কোনো আপত্তি আছে?

উ.—প্রস্তাবিত হাসপাতালটি হবে হিন্দু ও উচ্চ শ্রেণীর এদেশীয় অধিবাসীদের জন্যে এবং সেই কারণে বেসরকারী হাসপাতালের সাধারণ নিয়মের চেয়ে এর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। তাই আমার মনে হয়, মেডিক্যাল কলেজ কাউন্সিলের প্রস্তাবটি খুবই আপত্তিজনক। প্রস্তাবিত হাসপাতালটি যদি মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে এটি সম্পর্কে দেশীয়দের কুসংস্কার থেকেই যাবে।

প্র. ৩১—ধরুন, জ্বরের হাসপাতালটিকে যদি মেডিক্যাল কলেজ থেকে একটা দেওয়াল দিয়ে আলাদা করে দেওয়া যায়?

উ.—তাহলেও একটা আপত্তি থাকবে; এখানে যে পুলিস হাসপাতাল ছিল সে চিন্তা বোধহয় বহুদিনেও দূর হবে না। শবব্যবচ্ছেদের আতঙ্ক খুব বেশি; কোন লোকই ছাত্রদের শিক্ষার জন্যে নিজেকে পরীক্ষার বস্তু করবার অনুমতি দেবে না; লোকের মনে হবে প্রতিষ্ঠানটি ছাত্রদের উপকারের জন্যে, রুগীদের আরোগ্যের জন্যে নয়।

প্র. ৩২—তাহলে আপনি মনে করেন দুটি প্রতিষ্ঠান এক করা যুক্তিযুক্ত নয়?

উ.—আমার মনে হয়, এই ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাসপাতালকে যুক্ত করা উচিত নয়; এটিকে স্বতন্ত্রই রাখা উচিত। এদেশীয়েরা পছন্দ করবে না যে ছাত্রের দল তাদের কাছে আসুক। যে জনসাধারণের জন্যে এই প্রতিষ্ঠান তারাও এখানে আসতে চাইবে না। একথা ভালোভাবেই জানা আছে যে, যে-সাধারণ হাসপাতালে তাদের অনুভূতি ও সংস্কার প্রাধান্য পায় না, সেখানে তারা যাবে না। তার চেয়ে বরং চিকিৎসার অভাবে মারা যেতে কিংবা আরোগ্যলাভের সুযোগ হারাতে তারা রাজী আছে।

প্র. ৩৩—এদেশীয়রা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন লোকে তাদের দল বেঁধে দেখতে আসুক, এটা তারা চায় কিনা আপনি জানেন?

উ.—তারা চায় তাদের বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন আসুক, তবে একসঙ্গে একজন বা দু'জন করে।

প্র. ৩৪—কলেজের ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আপনি কি ভাবে দিতে চান ?

উ.—ঔষধাগার ও পুলিস হাসপাতাল কিংবা দেশীয় ও সাধারণ হাসপাতালগুলিতে যাওয়ার অধিকার ছাত্রদের আছে; তাছাড়া ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটিতে তারা এক সঙ্গে দু'তিনজন করে যেতে পারে। তার পর কলেজের পড়া শেষ হলে এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে যুক্ত থেকে তারা ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

প্র. ৩৫—দেশীয় হাসপাতালের ক্ষেত্রেও কি এই আপত্তি খাটে না ?

উ.—বর্তমান দেশীয় হাসপাতালগুলিতে যে সব রুগী আসে তাদের অধিকাংশই এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে নিচু শ্রেণীর লোক। তারা ইওরোপীয়ানদের কাছে কাজ করে এবং পুলিস তাদের এখানে পাঠায়। হাসপাতালে থাকার সময় এই সব রুগী অসহায় অবস্থায় পড়ে। আমার বিশ্বাস, যে নিয়ম সকলের প্রতি প্রয়োগ করা হয়, সে নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করতে তারাও বাধ্য হয়। সেই জন্যে অন্য ব্যবস্থা থাকলে এই হাসপাতালে তারা যতটা যেতে পারত ততটা যায় না। তাই দেশীয় হাসপাতালের রীতিনীতি ও নিয়মকানুন যদি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তাবিত জ্বরের হাসপাতালটিতেও প্রবর্তিত হয়, তাহলে আমার ভয় রয়েছে যে এর উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই জন্যে আমার চিন্তা সবসময় মাঝামাঝি ব্যবস্থার পক্ষে; যে-ব্যর্থতাকে এড়িয়ে যেতে পারি তাকে বরণ করার ইচ্ছা আমার নেই। এখনও এদেশের লোকেরা ভালোভাবে জানে না বা বোঝে না যে হাসপাতাল কি; তাই এবিষয়ে কিছু করতে গেলে সতর্কভাবে তাদের মনোভাব বিচার করে তবে করা উচিত।"

প্রদত্ত সাক্ষ্যটি অকপট। দেশের অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অবস্থার সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর আন্তরিক আগ্রহ বহন করে এই সাক্ষ্য।

রামকমল সব সময়ই পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। কাজকে তিনি কখনো ভয় করতেন না; পরিশ্রমের আদর্শ বলে মনে হত তাঁকে। শরীর ও মনের এই অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রমে তাঁর শরীর জীর্ণ হতে লাগল। এখানে অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে তিনি চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভালো বোধ না করায় গরিফায় চলে গেলেন। সেখানে নদীর ওপর একুশ দিন বাস করেছিলেন তিনি। মৃত্যুর দু'দিন আগে তিনি বাক্‌শক্তি হারালেন, কিন্তু মনে হচ্ছিল যে, কি ঘটছে বা না ঘটছে সে সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি সচেতন। মনে হয়, তিনি জানতেন যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন এবং সেই জন্যে গরিফা আসার দু'দিন আগে থেকে তিনি জপের মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। বাকশক্তি হারাবার আগে পরিবারের লোকদের তিনি বিশেষ-ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পরস্পরের প্রতি কর্তব্য। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অগস্ট ৬১ বৎসর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মহৎ গুণগুলির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে তাঁরা আন্তরিক ও গভীর দুঃখ অনুভব করলেন।

রামকমল নিরামিষাশী ছিলেন এবং কয়েক বৎসর রোগ ভোগ করার জন্যে অত্যন্ত অল্প খেতেন—চা ও জিলাপী, আর অফিসের কাজের পর খেতেন সামান্য পরিমাণ ভাত। তিনি তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের আপ্যায়িত করতেন চা খাইয়ে; তাদের সঙ্গে (চা পানে) তিনি যোগদান করতেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর আতিথ্যপরায়ণতা ও হৃষ্টচিত্ততার অভাব ঘটত না। শীতের সময় তিনি পুত্রপৌত্রদের নিয়ে আগুনের কাছে বসতেন; তাদের সেঁকা চাপাটি দিতেন আর ভগবৎপরায়ণতার

প্রাথমিক পাঠ হিসাবে আঙ্গুলে হরেকৃষ্ণ নাম গুনতে শেখাতেন।

তিনি প্রায়ই ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হতেন এবং আহারের আগে সর্বশক্তিমানের অনুধ্যান করতেন। নিজেকে প্রায়ই আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করে স্তোত্র রচনার অভ্যাস তাঁর ছিল। পুরাণ পাঠ শুনে আর পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর সন্ধ্যা-বেলা অতিবাহিত হত। তাঁর অভ্যাস ছিল সরল। সময় সময় নিজের অন্ন তিনি নিজেই রন্ধন করে নিতেন। তাঁর জীবন ছিল সারল্যের জীবন।

রামকমলের মতামত ছিল উদার। শ্যামচাঁদের ভাগ্নে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তার পরিবারকে জাতিচ্যুত করা হয়। ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করে রামকমল একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করে দেন।

আতিথেয়তা ছিল রামকমলের অন্যতম গুণ। প্রতি বৎসর হাজার-বারোশ বৈদ্য তাঁর বাড়িতে 'জলপান' খেতে বসতেন; বন্ধুত্ববৃদ্ধির জন্যে তাঁদের আপ্যায়ন করতেন তিনি। আপন বিনীত ভাব প্রকাশ করার জন্যে তিনি নিজে গিয়ে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতেন। তিনি একাদশী পালন করতেন, ভক্তিভাবে পূজার্চনা ছিল তাঁর প্রাত্যহিক কর্ম।

লর্ড উইলিঅম বেন্টিঙ্ক তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। মতিলাল শীল প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন উপদেশ নেবার জন্যে। বাড়িতে যে জীবন তিনি যাপন করতেন দোষের স্পর্শ লাগেনি তাতে। তিনি ছিলেন অনুরাগী স্বামী, স্নেহশীল পিতা, আদর্শস্থানীয় পিতামহ এবং পরিবারের প্রধান হিসাবে এক উদাহরণস্থল।

এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে তাঁর সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয় :—

"মৃত্যু যেসব সদস্যকে কমিটির মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে' রামকমল সেন তাঁদের মধ্যে বোধ হয় সর্বপ্রধান। তাঁর অভাব গভীর শোকাবহ। সোসাইটির প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পর থেকেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; সোসাইটির প্রথমযুগের সদস্যদের মধ্যে যে অল্প কয়েকজন জীবিত ছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অনেক বৎসর ধরে তিনি সোসাইটির দেশীয় সচিব ও সংগ্রাহকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন; কিছুকাল আগে তিনি এর সহসভাপতিরূপে নির্বাচিত হন। দেশের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে এদেশের অধিবাসীদের আগ্রহ যখন অত্যন্ত কম ছিল, সেই সময় যে সৎ উদাহরণ তিনি দেশবাসীর কাছে স্থাপন করেছিলেন, তা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দাবি রাখে। মাসিক অধিবেশনে তিনি নিয়মিত উপস্থিত হতেন, কৃষি-বিষয়ক কার্যাবলীতে তাঁর সজীব আগ্রহ দেখা যেত। দেশীয় সদস্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রায় অনন্য; এই কথা স্মরণ করে তাঁর বিয়োগে সোসাইটি গভীর দুঃখ অনুভব করছেন।"

রামকমল যেসব সোসাইটির সদস্য ছিলেন তাঁর মৃত্যুতে তারা গভীর শোক প্রকাশ করে। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পরে এশিয়াটিক সোসাইটির কক্ষে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সার্ এডওআর্ড রায়ন।

"সোসাইটির একজন প্রবীণ ও উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন সহযোগী এবং গুণবান কর্মী দেওয়ান রামকমল সেনের মৃত্যুতে

সেক্রেটারি গভীর শোক প্রকাশ করছেন। বিনম্র, এমন কি নীরব চরিত্র এবং ব্যাপক দানশীলতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য; কিন্তু তাঁর অর্জিত মহান গুণাবলী, তাঁর উদার মতামত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ় অনুরাগও তাঁকে প্রসিদ্ধ করেছিল; প্রতিটি সৎ ও প্রয়োজনীয় কাজে তাঁর যে অক্লান্ত উদ্যোগ ও পরিশ্রমে দেশীয় ও ইওরোপীয় সমাজ উপকৃত হত, তাও তাঁকে কম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেনি।

পূর্বে ভারতের সঙ্গে যুক্ত মিঃ কোলব্রুক, অধ্যাপক উইলসন, মিঃ ডব্লু. বি. বেইলি এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদের তিনি ছিলেন বন্ধু, এঁদের সঙ্গে পত্রালাপ চলত তাঁর। তিনি এখানকার মতো ইওরোপেও পরিচিত ছিলেন এমন এক ব্যক্তি হিসাবে, যাঁর শুধু নিজের দেশের সাহিত্যে অধিকারই ছিল না, মানবজাতির পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর স্বদেশের সন্তানেরা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে তা দেখার আকুল আগ্রহও ছিল। এই মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে তাঁর ব্যগ্র প্রয়াস যে প্রচুর উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটি জীবনের পক্ষে তার পরিমাণ সত্যই মাত্রাতিরিক্ত। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের দেওয়ানের অত্যন্ত দায়িত্বসম্পন্ন পদে তাঁকে যে কাজ করতে হত, তার সঙ্গে পড়াশুনার অত্যধিক শ্রম যুক্ত হওয়ায় তাঁর জীবনের অবসান ঘটল।

মাননীয় সভাপতির এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে যে, সোসাইটির গভীর শোক প্রকাশ করে একটি সহানুভূতিসূচক পত্র তাঁর পরিবারের কাছে লেখা উচিত।

"বাবু হরিমোহন সেন সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার পরলোকগত পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি যে গভীর ও অকৃত্রিম দুঃখ অনুভব করেছেন, সোসাইটির মাননীয় সভাপতি ও সদস্যবর্গের ইচ্ছাক্রমে তা আপনাকে জানাচ্ছি এবং তাঁর পরিবারের কাছে তা প্রকাশ করবার জন্যে অনুরোধ করছি।

মহাশয়, এই উপলক্ষে সোসাইটি আপনার ও তাঁর আত্মীয়-বন্ধুবর্গের কাছে তাঁর সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ না করে পারছেন না। তাঁর সাহিত্যকৃতি, দেশীয় শিক্ষার প্রতি তাঁর দৃঢ় সমর্থন, তাঁর ব্যক্তিগত ও লোকহিতকর গুণাবলী, সমাজের হিতার্থে দীর্ঘকালব্যাপী তাঁর অমূল্য কর্মধারা, এ সবই গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল তাঁর পরিচিত প্রতিটি ভারতবাসী ও ইওরোপীয় সাহিত্যপ্রেমীর কাছ থেকে। যেসব সহযোগীর বিয়োগে সোসাইটি গভীর শোক প্রকাশ করেছে তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ; চিরদিন সোসাইটি তাঁর কথা স্মরণে রাখবে এবং তাঁর অভাবে বেদনা অনুভব করবে।

মিউজিঅম,
৯ই অগস্ট, ১৮৪৪

ভবদীয়,
এইচ. টোরেন্স,
সহসভাপতি ও সম্পাদক,
এশিয়াটিক সোসাইটি,
১৫ই অগস্ট, ১৮৪৪"

সে সময় দেশের বিখ্যাত ইংরেজী সংবাদপত্র 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' মিঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যান, সি. এস. আই.-এর সম্পাদকীয় তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হত। এই পত্র নিম্নলিখিত সুন্দর ও গুণগ্রাহী ভাষায় রামকমল সেন সম্পর্কে লিখেছিল :—

"গত সপ্তাহে সংবাদপত্রগুলিতে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান বা কোষাধ্যক্ষ রামকমল সেনের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। কলকাতা র

দেশীয় সমাজে তিনি যে-উচ্চ পদ অধিকার করেছিলেন ও নিজের দেশবাসীদের মধ্যে যে-মহৎ প্রভাব সৃষ্টির গৌরব অনুভব করেছিলেন তা তাঁর মৃত্যুসম্পর্কিত একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তির চেয়ে আরও বেশী কিছু দাবি করে বলে মনে হয়। বর্তমান শতাব্দীতে যে-সকল দেশীয় ভদ্রলোক কলকাতার দেশীয় সমাজে ধনসম্পত্তি অর্জন ও বিতরণের দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে রামকমল সেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃত হতে পারেন। অন্যান্য অনেক ব্যক্তি একই রকম হীনাবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত ঐশ্বর্যশালী অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন, কিন্তু জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কেউই তাঁর মতো বিখ্যাত হতে পারেননি। যিনি সম্প্রতি লবণগোলার দেওয়ান ছিলেন, সেই বিশ্বনাথ মতিলাল মাসে আট টাকা বেতনে জীবন আরম্ভ করেন এবং সাধারণভাবে জানা যায় যে, অফিস ছাড়তে হওয়ার আগে তিনি বারো বা পনরো লক্ষ টাকা জমিয়েছিলেন। বাবু আশুতোষ দেবের পিতা রামদুলাল (দেব) ছিলেন ঐশ্বর্যশালী দেব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ফেয়ারলি ফার্গুসন অ্যাণ্ড কোম্পানির অধুনালুপ্ত ফার্মের কেরানী হওয়ার আগে একজন দেশীয় মালিকের কাছে মাসে পাঁচ টাকা মাইনেতে কাজ করতেন। পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানটিতে যুক্ত থাকার সময় এবং আমেরিকান বণিকদের চাকরিতে তিনি প্রভূত ধন সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে আমেরিকানেরা তাদের একটি জাহাজের নামকরণ করেছিলেন, রামদুলাল দে। টাকার বাজারে বর্তমান একাধিপতি, কলকাতার রথসচাইল্ড, মতিবাবু মাসে দশ টাকার সামান্য মাইনেতে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন। রামকমল সেনও নিজের সৌভাগ্য নিজেই গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ডক্টর হাণ্টারের হিন্দুস্থানী প্রেসে মাসিক আট টাকা মাইনেতে কম্পোজিটর হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন। আমরা যেসব দেশীয় ভদ্রলোকের কথা আলোচনা করেছি, তাঁদের চেয়ে কম

ধনসম্পত্তি তিনি আপন পরিবারের জন্যে উইল করে গিয়েছেন ; কোন বিবরণীতেও পাওয়া যায় না যে তাঁর ধনসম্পত্তির পরিমাণ দশলক্ষ টাকার বেশী, কিন্তু তিনি ব্যাপকতর প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন জ্ঞান ও সভ্যতার সঙ্গে তাঁর স্বদেশবাসীর পরিচয় স্থাপনের জন্যে। জ্ঞান ও সভ্যতার তিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত ও বিশিষ্ট প্রবর্ধক।

তিনি ছাপাখানায় কম্পোজিটরের নিচু পদে বেশী দিন ছিলেন না। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বর্তমান অধ্যাপক ডক্টর উইলসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। উইলসন তাঁর স্বাভাবিক ক্ষমতা ও জ্ঞানতৃষ্ণা আবিষ্কার করে তাঁর অগ্রগতির জন্যে সবরকম চেষ্টা করেন। আমাদের বিশ্বাস যে তাঁর প্রথম উন্নতি হয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের কোন নিচু পদে এবং এর দ্বারা তিনি ইওরোপীয় সমাজের কয়েকজন অত্যন্ত বিশিষ্ট সদস্যের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি প্রথমাবস্থাতেই ইংরেজী জ্ঞানার্জনের জন্যে পরিশ্রম সহকারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ইংরেজী বলতে শিখেছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করছি সে সময় ইংরেজীতে কথ্যভাষায় ভালো জ্ঞান খুব দুর্লভ ছিল এবং এতে দখলই ছিল খ্যাতি অর্জনের নিশ্চিত ছাড়পত্র। কলকাতার স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে রামকমল একজন নেতা হিসাবে শীঘ্রই পরিচিত হন। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হবার পর তাঁকে এর কমিটিতে গ্রহণ করা হয় এবং অনেকগুলি প্রয়োজনীয় পুস্তকের সংকলন ও অনুবাদ করে তিনি এর কার্যে যথার্থভাবে সাহায্য করেন। এক বছর পরে হিন্দু কলেজের কাজ শুরু হলে তাঁর নিত্য পৃষ্টপোষক ডক্টর উইলসনের অনুকূল মন্তব্যের ফলে এর সংগঠনের কাজ অনেকখানি তাঁর ওপর অর্পিত হয়।

এইখানে তিনি তাঁর নিজের দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর আগ্রহকে নিয়োজিত করার ও কোনো কাজের জটিল খুঁটিনাটি সম্পাদনে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা দেখানোর সুযোগ লাভ করেছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর স্থান দেশীয় সমাজে তাঁর পদমর্যাদাকে যথার্থভাবে বৃদ্ধি করেছিল ও পরে যে-প্রতিপত্তি তিনি অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের তিন বছর পরে তিনি ডক্টর কেরীর জ্যেষ্ঠপুত্র মিঃ ফেলিক্স কেরীর সহযোগে ইংরেজী ও বাঙলা অভিধান প্রকাশের পরিকল্পনা করেন ; কিন্তু বইটির একশত পাতা ছাপা হওয়ার আগেই ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুতে এই কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। আমাদের বিশ্বাস এর কিছুকাল পরেই অ্যাসেমাস্টার ডক্টর উইলসনের দ্বারা তিনি টাঁকশালের দেশীয় শাখার প্রধানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তিনি উচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করেন। কলুটোলায় তাঁর ভবন ধনী ও পণ্ডিতদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে এবং তাঁর মহত্ত্বের খ্যাতি বাঙলার বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অভিধানের পরিকল্পনা পুনরায় গ্রহণ করেন এবং ব্যক্তিগত পরিশ্রমে কাজটি শেষ করে, ছাপিয়ে ৭০০ পৃষ্ঠা কোয়ার্টো আকারে বই হিসাবে প্রকাশ করেন। এই ধরনের যত বই আমাদের আছে তাদের মধ্যে এটি সব চেয়ে বেশী সম্পূর্ণ ও মূল্যবান। তাঁর পরিশ্রম, আগ্রহ ও শিক্ষার সবচেয়ে স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ হবে এই বই। সম্ভবত এই কাজের জন্যেই তাঁর নাম ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক স্বীকৃতি লাভ করবে।

ডক্টর উইলসনের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে ব্যাঙ্কের দেশীয় কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। কয়েক মাস পূর্বে তাঁর শরীরে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। যে অসাধারণ ব্যক্তিগত পরিশ্রম করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন ও যা তাঁর উন্নতির অন্যতম প্রধান উৎস ছিল, আমাদের সন্দেহ নেই যে, সেই পরিশ্রমের ফলেই তাঁর ক্ষয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হুগলী শহরের বিপরীত দিকে অবস্থিত পল্লীতে তাঁর পারিবারিক ভিটায় তিনি প্রায় একপক্ষকাল পূর্বে মারা যান।

কলকাতায় এমন প্রতিষ্ঠান প্রায় নেই যার সদস্য তিনি ছিলেন না বা যাকে উন্নত করার জন্যে ব্যক্তিগত পরিশ্রম দিয়ে তিনি চেষ্টা করেন নি। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির কমিটি অফ পেপারস-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি এগ্রিকালচারাল সোসাইটির সহসভাপতি ছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটির কমিটির তিনি ছিলেন একজন। তিনি হিন্দু কলেজের একজন পরিচালক ছিলেন। ইওরোপীয় ও দেশীয় সমাজে সমান ভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি। অনেক দিন ধরেই তিনি রাজধানীর সব চেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী দেশীয়দের অন্যতম হিসাবে গণ্য হয়ে আসছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান ও কোন কোন সময়ে গোঁড়া হিন্দুর আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন, কোন সময়েই আপন ধর্মবিশ্বাসকে পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে যাননি; তবু তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের যেসব প্রচেষ্টা হয়েছিল তাতে প্রধান অংশ গ্রহণের কৃতিত্ব ছিল তাঁরই। সেই সময়ই লর্ড হেস্টিংস এ ধারণা ত্যাগ করেন যে, জনসাধারণের অজ্ঞতাই হচ্ছে তাঁদের দৃঢ়তম নিরাপত্তার ভিত্তি। যেসব দেশীয় প্রতিষ্ঠান ইওরোপীয় বিজ্ঞান প্রচার করেছে এবং দেশীয় সমাজের চিন্তাধারার এতো উন্নতি ঘটিয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগীদের মধ্যে রামকমল ছিলেন অন্যতম।"

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর ডক্টর উইলসন নীচেকার পত্রটি লেখেন :—

"রামকমলের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে ডক্টর গ্রাণ্ট ও মিঃ পিডিংটনের কাছ থেকে আমি যে বৃত্তান্ত পেয়েছিলাম তাতে আমি কতক পরিমাণে এক বিষাদজনক পরিণতির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। এই পরিণতির কথা আপনার চিঠিতে জেনেছি এবং তার জন্যে গভীর ও আন্তরিক দুঃখ অনুভব করেছি।

বহু বৎসরের বিশ্বস্ত যোগাযোগে আমি সম্যকভাবে স্বর্গত বন্ধুর গুণাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম এবং তাঁর পরীক্ষিত যোগ্যতার জন্যে তিনি আমার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জন করেছিলেন। কলকাতার

দেশীয় অথবা ইওরোপীয় সমাজ এঁর চেয়ে বেশী নির্দোষ ও ও খাঁটি কোন চরিত্রগৌরবে গর্ব বোধ করতে পারে না। নিজের দেশের কল্যাণ ও দেশবাসিগণের উন্নতি ছিল তাঁর জীবনের মহৎ লক্ষ্য; কিন্তু কখনো তাঁর স্বদেশপ্রেম তিনি সাড়ম্বরে প্রকাশ করতে চাইতেন না। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা না করে তিনি বরং দৃষ্টি এড়িয়েই চলতে চাইতেন। দেশের উদীয়মান সম্প্রদায়ের জন্যে সততা ও আগ্রহের সঙ্গে পরিশ্রম করলেও তিনি কখনও অকারণ ব্যস্ততা দেখাতেন না বা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। তিনি চাইতেন প্রতিটি পরিবর্তন ধীরে ধীরে নিজের থেকে নিরাপদে ঘটুক। তাঁর চেয়ে বেশী ব্যস্ত বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী অনেক সহযোগীর তুলনায় সেইজন্যে তিনি কিছুটা কম জনপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁরা অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তাঁর গুণ উপলব্ধি করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে আমিও একজন বলে গর্বিত। তাঁর অধিকাংশ বন্ধুদের তুলনায় আমি তাঁর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলাম। তাঁকে বিশ্বস্তভাবে দেখার সুযোগ থেকে এটুকু আমি বুঝেছি যে, এদেশের উন্নতির জন্যে উপরপড়া হয়ে তিনি কিছু করেননি, কিন্তু সে উন্নতির তিনি ছিলেন সমর্থক এবং সে উন্নতিসাধনে তিনিও প্রয়াসী ছিলেন।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে রামকমলের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত। তিনি তখন ডক্টর উইলিঅম হাণ্টারের চাকরিতে ছিলেন এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে হিন্দুস্থানী প্রিন্টিং প্রেস পরিচালনা করতেন। এই প্রেসের মুখ্য স্বত্বাধিকারী ছিলেন ডক্টর হাণ্টার। সেই সময় ডক্টর লেডেন ও আমি ডক্টর হাণ্টারের সঙ্গে সম্পত্তির অংশীদার হই এবং ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে যখন সেই ভদ্রলোক ও ডক্টর লেডেন জাভা চলে যান তখন তাঁরা ছাপাখানাটি অন্তত নামে মাত্র হলেও আমার তত্ত্বাবধানে রেখে যান। তরুণবয়স্ক আমি তখন মুদ্রণ ব্যবসায়ের সঙ্গে খুব অল্পই পরিচিত ছিলাম এবং ছাপাখানার প্রকৃত পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রামকমল। ডক্টর হাণ্টার ও ডক্টর লেডেন দু'জনেই

জাহাজডুবিতে মারা যান এবং ছাপাখানাটি প্রায় সম্পূর্ণই আমার হাতে চলে আসে। ক্যাপ্টেন রোবাক আমার সঙ্গে যোগ দেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাটি অন্যান্য মালিকদের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া পর্যন্ত রামকমল ব্যবসায়ের সমস্ত খুঁটিনাটি পরিচালনা ক'রে যান। এই সময় তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সরকারও ছিলেন এবং আমি ছিলাম এর সেক্রেটারি। এই দায়িত্ব ও কাজের ভার আমাদের ওপর থাকার ফলে আমরা প্রত্যহ ঘনঘন একত্র হতাম এবং আমি তাঁর কর্মদক্ষতা, সততা ও স্বাধীন মনোভাব জানার সমস্ত সুযোগ পেতাম। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, তাঁকে ভালবাসতাম এবং আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের পরিচালনাতেও তাঁকে বিশ্বাস করতাম। আমার নিজের চেয়ে তাঁর পরিচালনায় সেগুলি অনেক বেশী লাভজনক হয়েছিল। অনেক বিষয়ে আমরা এক ছিলাম। যদিও সময়ের অভাবে তিনি সংস্কৃতে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি, তবু সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং সংস্কৃতের অধ্যাপকদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। বাঙলায় তাঁর কি রকম উৎকৃষ্ট দখল ছিল তা আপনারা জানেন; এই সব বুৎপত্তি এবং এশিয়াটিক সোসাইটির (তিনি শেষ পর্যন্ত এর দেশীয় সেক্রেটারি হয়েছিলেন) সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর মধ্যে জ্ঞানানুরাগের সঞ্চার করেছিল। এই জ্ঞানানুরাগ তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কালক্রমে তিনি টাঁকশালের দেওয়ান হন এবং আমার কলকাতা ত্যাগের কাছাকাছি সময়ে ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করি। সুতরাং প্রথম যখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তার পর তেইশ বৎসর কেটে গেছে এবং এই সমস্ত সময়ের মধ্যে আমি সর্বদা তাঁকে এক রকম ও সঙ্গতিপূর্ণভাবে বুদ্ধিমান, ক্লান্তিহীন, সৎ ও অবিচলিত দেখেছি। আমি কখনও মুহূর্তের জন্যেও দেখিনি যে, তাঁর বোধশক্তি স্থূল হয়েছে বা তিনি পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন; তাঁকে উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হতেও আমি কখনও দেখিনি। আমি কখনও বিশ্বাস করিনি বা এখনও করি না যে,

তাঁর সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যক্তির তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রচুর আর্থিক স্বার্থ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে ক্ষণিকেরও সন্দেহ হয়েছে। টাঁকশালে অধিকাংশ সময়েই তাঁকে দিনে প্রায় দশ বারো ঘণ্টা প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। তবু তিনি সব সময় প্রফুল্ল এবং কাজে সতর্ক থাকতেন। যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনেই ছিল তাঁর প্রকৃত সুখ। তাঁর দেশবাসিগণের সঙ্গে আমার সমস্ত যোগাযোগে একজন উপদেষ্টা হিসাবে এবং একজন সহকর্মীরূপে আমার কাছে তিনি ছিলেন অসীম যোগ্যতাসম্পন্ন। আমি তাঁর বিচারশক্তি ও বিচক্ষণতার ওপর সব সময় নিঃসন্দেহে নির্ভর করতে পারতাম।

আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ ছিল বলে আমি তাঁর সহায়তা এবং সমর্থন লাভ করেছিলাম। সংক্ষেপে বলতে গেলে ছাপাখানায়, এশিয়াটিক সোসাইটিতে, সাহিত্যসাধনায়, টাঁক-শালে ও কলেজে আমরা সব সময় যুক্ত ছিলাম। যে সুদীর্ঘ ও অব্যাহত হৃদ্যতায় আমাদের উদ্দেশ্য এতো বৎসর ধরে অভিন্ন ছিল তা স্মরণ করা নিশ্চয়ই একটি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অনুস্মৃতির বিষয় হবে। কলকাতায় এমন ব্যক্তি খুব কমই আছেন যাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আমি ততটা বেদনা অনুভব করেছি যতটা করেছি রামকমলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময়। যেসব বিষয়ে আমাদের আগ্রহ এখনও একরকম ছিল সেগুলি সম্পর্কে পত্রে যোগাযোগ হত, তা পর্যাপ্ত না হলেও কিছুটা ক্ষতি পূরণ হত। আমি সব সময় অধৈর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতাম তাঁর পত্রের আশায়। যে মানসিক সক্রিয়তার জন্যে পত্রের লেখক প্রসিদ্ধ ছিলেন শুধু তার নিদর্শন হিসাবে নয়, অক্ষয় শ্রদ্ধার প্রমাণ হিসাবেও সেগুলিকে মূল্য দিতাম। তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মানসিক সক্রিয়তা অব্যাহত ছিল জেনে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছি ; একমাত্র মৃত্যু ঘটলেই আমি তাঁকে অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা থেকে বিরত হব।"

চড়কপূজা সম্পর্কে রামকমলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ও এই পূজায় ব্যবহৃত সাজসরঞ্জামের বর্ণনা এশিয়াটিক সোসাইটিতে

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়। রামকমল ধর্মতলাস্থিত দেশীয় হাসপাতালের একজন গভর্নর ছিলেন। তিনি অবিনয়ী ছিলেন না বা অন্যায়ভাবে কোথাও হস্তক্ষেপ করতেন না; শিক্ষা, কৃষি, দান, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং হিন্দুসাহিত্য ও বিজ্ঞানসম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা তাঁর মনকে অধিকার করে থাকত। তবুও কর্তব্যের জন্যে বাধ্য হলে তিনি সরকারের যেসব ব্যবস্থাকে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন সেগুলির বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক-ভাবে ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিবাদ করতেন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির একজন সদস্য হন এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত বৃহৎ সভায় তিনি নিম্নলিখিত যে বক্তৃতা দেন তা "অত্যন্ত সুন্দর ও যথোচিত" বলে বিবেচিত হয় :—

"গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা ধর্মের (স্বর্গলোকবাসী দেবতার) ওপর বিশ্বাস করে ও ধর্মাবতারদের (ভারতবর্ষস্থ সরকারী কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি) ওপর নির্ভর করে ধৈর্য ধরে রয়েছি। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের সঙ্গে এখন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শুধু জমিদারদের অবস্থার তুলনা করুন এবং বলুন তাঁদের উন্নতি হয়েছে না অবনতি হয়েছে। যদি তাঁদের অবনতি হয়ে থাকে তবে ইংলণ্ডে ধর্মাবতারদের কাছে আমাদের অবস্থা অবহিত করিয়ে প্রতিকার ও উন্নতিবিধানের চেষ্টা করার ব্যাপারে আর চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই শ্রেষ্ঠ সুযোগ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে এবং আমরা আর দেরি না করে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির সঙ্গে যোগদান করব ও সেখানে অবশ্যই আমাদের একজন প্রতিনিধি থাকবে। অ্যাসোসিয়েশনের একজন প্রধান ব্যক্তির নাম আমাদের জানা আছে (সরকারী প্রকাশনার দৌলতে)। তাঁর চরিত্র ও লোকহিতৈষণামূলক কার্যাবলী থেকে নিঃসন্দেহে আমরা উপকৃত হব। এই প্রতিনিধিত্বের জন্যে আপনাদের কিছু ব্যয় হবে,

কিন্তু এটা প্রতি বৎসর কালেক্টর, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে জমিদারদের যে-ব্যয় হয় তার এক-দশমাংশ হবে না এবং পরিশেষে নবম-দশমাংশ বেঁচে যাবে।"

রামকমল গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, কিন্তু মতবাদে তিনি ছিলেন উদার। তিনি ইংরেজী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি চিকিৎসবিজ্ঞান বিস্তারে সমর্থন জানাতেন। তিনি বাছ-বিচারহীন দানকে নিন্দা করতেন। তিনি বলতেন, যে-লোক ভিক্ষা পাওয়ার যোগ্য তাকে ভিক্ষা না দেওয়া যতটা অন্যায় যে ভিক্ষালাভের পক্ষে অনুপযুক্ত তাকে ভিক্ষা দেওয়াও ঠিক ততখানি অন্যায়।

মুমূর্ষুকে নদীতে নিয়ে যাওয়ার প্রথাকে কলকাতায় যিনি প্রথম ধিক্কার জানিয়েছিলেন তিনি হলেন রামমোহন রায়। আত্মা গঙ্গার জলে পবিত্র হয়ে স্বর্গে যাবে, এই আশায় মুমূর্ষুকে জলে ডোবানোর যে-রীতি রামকমলও তাকে নিন্দা করেন। একে তিনি 'ঘাটহত্যা' নামে অভিহিত করেছিলেন। চড়ক-পূজা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল যে, এই অসঙ্গত প্রথার জন্যে গোটা হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনা উচিত নয়। রামকমল ইওরোপীয়দের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করতেন। তাঁর মানিকতলার বাড়িতে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে আপ্যায়িতও করতেন তিনি।

গোড়ার দিকে অনেক হিন্দু হীনাবস্থা থেকে উন্নতিলাভ করেছিলেন। নবকৃষ্ণ যখন শোভাবাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময় ক্লাইভের দূত এমন একজন লোকের সন্ধান করছিল যে পারসিক দলিলপত্র পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে পারে। নবকৃষ্ণ কাজ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং পারসিক

ভাষায় জ্ঞানই হল তাঁর উন্নতির মূল। রামদুলাল দে মাসিক পাঁচ টাকা মাইনেতে মদনমোহন দত্তের চাকরিতে ছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সরকারগিরি থেকে ফেয়ারলি, ফার্গুসন অ্যাণ্ড কোং-এর ফার্মে মুৎসদ্দীগিরি লাভ করেছিলেন এবং নিজে জাহাজের একজন মালিক পর্যন্ত হয়েছিলেন। মতিলাল শীল মাসিক আট টাকা মাইনের চাকরিতে জীবন আরম্ভ করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর উন্নতি লাভ করেছিলেন অখ্যাত অবস্থা থেকে এবং তিনি উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন না হলেও তাঁর বুদ্ধিগত ও সামাজিক উন্নতির জন্যে প্রবল সাধারণ বুদ্ধির কাছে তিনি ঋণী। যদি কোন দেশীয় ব্যক্তি ইওরোপীয় ও দেশীয়দের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের, সেতু ভেঙে থাকেন তবে তিনি হলেন দ্বারকানাথ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজারা দ্বারকানাথের মতো বাঙলার আর কোনো অধিবাসীকে এতো সম্মান প্রদর্শন করেননি। জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানসমূহকে, তাঁর অসংখ্য বন্ধু ও পরিচিতদের এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী যে কোনো ব্যক্তিকে তিনি যে সুপ্রচুর দান করতেন তা তাঁকে এই শহরের সবচেয়ে বদান্যশীল দেশীয় অধিবাসী হিসাবে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। রাজা সার্ রাধাকান্ত দেবের জীবনও শিক্ষাপ্রদ, কেননা তিনি তাঁর সমস্ত জীবন সাহিত্যচর্চা ও শিক্ষাবিস্তারে উৎসর্গ করেছিলেন। হিন্দু কলেজ ও স্কুলবুক সোসাইটির সদস্য হিসাবে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্ত্রীশিক্ষায় তিনি যে-প্রেরণা দিয়েছিলেন তা বাঙলাদেশের প্রতিটি দেশীয়ের কাছে তাঁর নামকে চিরকাল প্রিয় করে রাখবে। রামকমল সেনের জীবনীও আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য হতে

পারে। তিনি কোনো কলেজের শিক্ষা লাভ করেননি, তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন এবং মাসিক আট টাকা মাইনেতে তাঁর জীবন আরম্ভ হয়। স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি বা অসাধারণ পরিশ্রম বা দোষস্পর্শহীন চরিত্রের জন্যেই হোক বা এই সব গুণের সমন্বয়েই হোক তাঁর উন্নতি লাভ করতে দেরি হয়নি। যেটি তাঁর মধ্যে সব চেয়ে প্রশংসনীয় তা হচ্ছে এই যে, তিনি অর্থসঞ্চয় ও জাগতিক জাঁকজমক উপভোগের জন্যে জীবন ধারণ করেননি; তাঁর অবিরত ধ্যান এই ছিল যে তাঁর দেশবাসিগণের বুদ্ধিগত ও নৈতিক অবস্থার উন্নতিবিধানে, শহরের চরম অভাবগ্রস্ত ও অসহায় শ্রেণীদের দুঃখমোচনে, রোগের কারণ আবিষ্কার ও প্রতিষেধের দ্বারা অসুস্থকে চিকিৎসার সুযোগ দানে ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে নিজেকে এক-জন সহায়ক করে তুলবেন। একজন কম্পোজিটর থেকে তিনি পরিশ্রমশক্তির সাহায্যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মতো বাঙলার দেশীয়দের মধ্যে সর্বাগ্রবর্তী স্থানে নিজেকে উন্নীত করেছিলেন এবং ইওরোপীয় ও দেশীয়দের দ্বারা সমানভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। যদিও তিনি দৃঢ় নিষ্ঠায় আপন ধর্মমত অনুসরণ করে চলতেন এবং আপন ইওরোপীয় বন্ধুদের খাতিরেও আপন মত এতটুকু বিসর্জন দেননি, তবু তার জন্যে তিনি একটুও কম সম্মানিত হতেন না। তিনি ও সার্ রাজা রাধাকান্ত, যাঁরা ইও-রোপীয়দের সঙ্গে এতো মিশতেন, তাঁরা এক ধর্মমতের ছিলেন। তাঁরা উভয়েই বৈষ্ণব হয়ে ভক্তির আদর্শ ও আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকতেন এবং এই ভগবৎপ্রেম, তার রূপ বা মর্ম যে-কোনভাবে তাঁদের চিন্তা ও কার্যসমূহের প্রধান আদর্শ ছিল। সার্ রাজা রাধাকান্ত একজন আমেরিকান মিশনরীকে বলেছিলেন,

"আমার ধর্ম হচ্ছে সালোক্য, ভগবানের সঙ্গে একই স্থানে (জগৎ) অবস্থান করা; সামীপ্য, অনন্তকাল ধরে ভগবানের নিকট থেকে নিকটতর হওয়া; সাযুজ্য, ভগবানের সঙ্গে প্রকৃত সমন্বয়ে যুক্ত হওয়া ও নির্বাণ, ভগবানের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া।" রামকমলও নিশ্চয়ই এইভাবে চিন্তা ও অনুভব করেছিলেন এবং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে-ধর্ম তাঁরা আচরণ করতেন তা হচ্ছে খাঁটি একেশ্বরবাদ, যদিও জনসাধারণকে নাস্তিকতা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার জন্যে প্রতিমা পূজাকে তাঁরা সমর্থন জানাতেন। একথা প্রায়ই বলা হয় যে, ইয়ং বেঙ্গলের চেয়ে প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম আছে বেশী। বেদনাদায়ক হলেও একথা স্বীকার করতে হয় যে, এই মন্তব্যে অনেকখানি সত্য বর্তমান। প্রাচীন হিন্দুরা ভগবান ও পরবর্তী জগতের কথা চিন্তা করে, যদিও উভয় সম্পর্কে তাদের ধারণা আত্মাবস্থা থেকে উদ্ভূত না-ও হতে পারে, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের অধিকাংশই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরতা অস্বীকার করে। তারা জীবনকে কেবল প্রোটোপ্ল্যাজম-ঘটিত বলে মনে করে এবং হাক্সলি, স্পেন্সার, মিল অথবা সম্ভবত ব্রাডলগকে (Bradlaugh) পথপ্রদর্শক হিসাবে অভ্রান্ত গণ্য করে।

রামকমলের অপরকে সেবা করার প্রবল আগ্রহ ছিল। কোনো এক উপলক্ষে তাঁর একজন ইওরোপায় বন্ধু তাঁকে তাঁর জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিন হতে বলেন। এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা না করে তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হন। এটা বাস্তবিকই অসাধারণ ব্যাপার। ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিকে অনাথাশ্রম

নির্মাণের জন্যে একখণ্ড জমি দান করেছিলেন তিনি।

রামকমল চার জন পুত্র রেখে যান। জ্যেষ্ঠপুত্র হরিমোহন ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অগস্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর প্রথম চাকরি হয় ডক্টর উইলসনের অধীনে পুরাণ অনুবাদের কাজে। তিনি টাঁকশালের ও পরে সাধারণ সরকারী কোষাগারের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। শেষোক্তের অবর কোষাধ্যক্ষ মিঃ ওকস তাঁর কর্মশক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে প্রামাণিক বিবৃতি দিয়েছেন। পরে তিনি ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের দেওয়ান হন। সেক্রেটারি মিঃ চার্লস হগের সঙ্গে মতপার্থক্যের দরুন তিনি এই পদ পরিত্যাগ করেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, যদি তিনি কাজ চালিয়ে যান, তাহলে তাঁর স্বাধীনতা খর্ব হবে। তিনি মেকানিকস ইনস্টিটিউট, লাইসিঅ্যাম, ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন এবং লর্ড ডালহাউসির পরিচালনায় রাজধানীতে অনুষ্ঠিত শিল্পপ্রদর্শনীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি, এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া ও ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির দেশীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি কিছুকাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি বেথুন সোসাইটিরও সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাবিত ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের দেশীয় আইন অ্যাক্ট ২১-এর বিরুদ্ধে বাঙলার হিন্দুগণ কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটিতে কিছুকাল সেক্রেটারির কাজ করেন এবং প্রমাণ করেন

যে, তাঁর কর্মনৈপুণ্য মৌমাছির মতো। কমিটির লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি মিঃ লিথ, লর্ড মন্টিগেল ও লর্ড এলফিনস্টোন প্রমুখ যাঁরা দেশীয়দের আবেদনপত্রকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি তাঁদের সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউ-শনের জয়েণ্ট সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেন। এই হিন্দু অবৈতনিক বিদ্যালয়টি ডক্টর ডাফ কর্তৃক স্থাপিত শিক্ষালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে জনসাধারণের চাঁদায় খোলা হয়েছিল। হরিমোহন শুধু উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন ও মানসিক সৌন্দর্যবোধবিশিষ্ট ছিলেন না, তাঁর কর্মশক্তিও ছিল অক্লান্ত। বিদ্রোহের পরে যখন আগ্রাতে দরবার অনুষ্ঠিত হয় তখন হরিমোহন নিজেকে বিশেষভাবে হিজ-হাইনেসের নজরে আনেন। ইতোমধ্যেই তিনি জয়পুরের স্বর্গত মহারাজা রাম সিং-এর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন ও তাঁর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। পণ্ডিত শিওদীনের মৃত্যুর পর মহারাজা হরিমোহনকে ডেকে পাঠান, তবে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হরিমোহন মহারাজার প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করার জন্যে নিযুক্ত হননি। এই সময় তিনি রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে অনেক সংস্কারের প্রবর্তন করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দেশীয় রাজ্যসমূহে বাঙালীদের সম্বন্ধে লিখেছিল, "সুপরিচিত বাবু রামকমল সেনের সুপরিচিত পুত্র বাবু হরিমোহন সেন পরলোকগত মন্ত্রী পণ্ডিত শিওদীনের পরে রাজার মন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্যে জয়পুরের মহারাজা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছেন, এটা খুবই আনন্দদায়ক। এই গুজব যদি সত্য হয় তবে এতে জয়পুর রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস

দেখতে পাওয়া যায়। জয়পুরের মহারাজা দেশীয় রাজ্যে সর্বপ্রথম শিক্ষিত বাঙালীদের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণের যে-নীতির সূত্রপাত করেছেন তার সঙ্গে দেশীয় রাজাদের প্রজাদের ভাগ্য ও প্রাচ্যে ব্রিটিশ শক্তির স্থায়িত্বের দিক দিয়ে গভীর গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন জড়িত।" একমাত্র হরিমোহনের শাসনসম্বন্ধীয় বিশেষ যোগ্যতার জন্যেই শিক্ষিত বাঙালীদের সম্পর্কে মহারাজের ধারণা উন্নত হয়েছে এবং তিনি তাঁর চাকরিতে অনেক বাঙালী নিয়োগ করেছেন। কিছুকাল পূর্বে কানপুর থেকে প্রকাশিত দ্বি-সাপ্তাহিক 'অবজার্ভার' হরিমোহন সম্পর্কে এই রকম বলেছে, "জয়পুরের শাসনব্যবস্থার অনেক বিভাগে যেসব সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে তা রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও প্রধানত অত্যন্ত যোগ্য ও শিক্ষিত বাঙালী বাবু হরিমোহন সেনের প্রভাবের উপর আরোপ্য। ঐশ্বর্যশালী দেশীয় রাজসভা থেকে অবিচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাজনিত প্রায় অদম্য বিরোধিতা সত্ত্বেও এই ভদ্রলোক জয়পুর রাজ্যের হিতসাধন-মূলক কর্মে যে গভীর অনুরাগ দেখিয়েছেন ও যে প্রবল বিচার-শক্তিতে তিনি একটি দেশীয় রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করে চলেছেন তা উচ্চতম প্রশংসার দাবি করে।" জয়পুরের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও ইওরোপীয়ান অধিবাসিগণ তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। জয়পুরের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উন্নতির বিষয়ে হরিমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। তিনি একটি পরিষৎ স্থাপন করেছিলেন ও এর সদস্যদের শপথ গ্রহণ করানো হত। এটা বাস্তবিকই অভিনন্দনযোগ্য যে, মহারাজা উন্নতভাবের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল গুণোপলব্ধির পরিচয়

দিয়েছেন এবং তাঁর প্রজাদের সুখের বৃদ্ধির জন্যে যা যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন তাই গ্রহণ করেছেন। হরিমোহন জয়পুর কলেজকে একটি উন্নত ও যোগ্য ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি সহায়ক ছিলেন। তিনি মহারাজাকে শহরে গ্যাস প্রবর্তনের জন্যে উপদেশ দেন। তিনি আরও অনেক বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর জন্যে সেগুলি সম্পাদিত হয়নি।

হরিমোহন ভালো সংগীতবিৎ ছিলেন এবং পিআনোর প্রতি তাঁর এত আসক্তি ছিল যে তিনি সেটিকে নদীতে প্রমোদ ভ্রমণের সময় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তিনি সংস্কৃত, বাঙলা, পারসিক ও উর্দু ভাষা জানতেন। তিনি যদুনাথ, মহেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ নামে পাঁচটি ছেলে রেখে যান। নরেন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য সকলে জয়পুরে মহারাজার চাকরিতে আছেন। উপেন্দ্রনাথ পিতার সৌন্দর্যবোধের উত্তরাধিকারী হয়েছেন; তিনি জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন হরিমোহনের আদরের ছেলে। তিনি যখন অ্যাটর্নিশিপ পড়ছিলেন তখন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র জন্যে লিখতে আরম্ভ করেন। এটা তখন ছিল পাক্ষিক পত্র। হাইকোর্টের সলিসিটর নরেন্দ্রনাথ 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন। এটি ছিল ইংরেজীতে প্রথম দৈনিক দেশীয়পত্র। এটা তাঁর পক্ষে খুবই কৃতিত্বজনক যে তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রতিষ্ঠার জন্যেই যে শুধু প্রশংসনীয় উদ্যম ও কর্মশক্তি দেখিয়েছেন তা নয়, তিনি যেসব ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাতে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামহদের কাছ থেকে

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রের দিক দিয়ে নরেন্দ্রনাথ তাঁর যুগের তরুণ সমাজের আদর্শ। তা ছাড়াও তিনি দেশীয় সলিসিটরদের মধ্যে প্রথম ও একমাত্র নোটারি রিপাবলিক, কলকাতায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইনের অন্তর্গত বিবাহের রেজিস্ট্রার এবং জয়পুরের মহারাজার কলকাতায় নিযুক্ত ভকিল বা প্রতিনিধি। তিনি বহু বৎসর ধরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কমিটির সদস্যও রয়েছেন।

মহেন্দ্রনাথ জয়পুর রাজ্যের ইংরেজী বিভাগের ও রাজ ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত এবং 'জয়পুর গেজেট'-এর সম্পাদক।

যদুনাথ জয়পুর পরিষদের সদস্য।

পুত্রগণ ছাড়া হরিমোহন একটি কন্যাও রেখে যান। ইনি কলকাতার একজন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. এল. গুপ্তের মা।

রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। পিতার মতো তিনিও বৈষ্ণব ছিলেন ও তিলক পরতেন। তিনি কলকাতার টাঁকশালের দেওয়ান ছিলেন। পূর্বে তিনি ব্যাগশ অ্যাণ্ড কোম্পানির মুৎসদ্দীর কাজ করতেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর তারিখে ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। তিনি তিন পুত্র রেখে যান—নবীন, কেশব ও কৃষ্ণবিহারী।

রামকমলের তৃতীয় পুত্র বংশীধর প্যারীর পর টাঁকশালের বুলিঅ্যান-কিপার হিসাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি খুব সংগীতপ্রিয় ছিলেন ও অনেক রকম যন্ত্র বাজাতে পারতেন।

রামকমলের চতুর্থ পুত্র মুরলীধর হাইকোর্টের সলিসিটর। তিনি তাঁর ভাইদের মতো হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং সেখানে ইংরেজীতে উচ্চ যোগ্যতার প্রশংসাপত্র লাভ করেন। তিনি প্রথমে মিঃ ব্যারোর আর্টিকেল্ড ক্লার্ক ও পরে তার একজন অংশীদার হন। মুরলীধরের মুখ তাঁর অন্তরের রূপকে ব্যক্ত করত। তাঁর মধ্যেকার অমায়িকতা ও সদাহাস্যপরায়ণতা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি একজন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং কিছুকাল পূর্বে কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের কমিশনার নির্বাচিত হন।

রামকমল কেশবকে বলতেন 'বেসো'। তিনি মৃত্যুর পূর্বে প্যারীমোহনকে বলেন, 'প্যারী, তোমার ছেলে বেসো ভাগ্যের বিধানে একজন মহাপুরুষ—ধর্মসংস্কারক হবে।' কেউ হয়তো ভাববেন যে, রামকমলের এই ধারণাই কেশবচন্দ্রকে পথ দেখিয়েছে। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে রামকমলের বৈষ্ণব-ধর্মের আভাস আছে। পিতামহ ও পৌত্র উভয়েই ভগবানকে বলতেন, 'হরি'। পৌত্র নিরামিষাশী হয়ে, স্তোত্র গান করে এবং পিতামহের খোল ও করতাল যন্ত্রের সাহায্যে সংকীর্তনে ভগবানের পূজা করে পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। অধ্যাত্মবাদীরা বলবেন যে রামকমলের আত্মা ছিল কেশবচন্দ্রের অভিভাবকরূপী দেবদূত।

কেশবচন্দ্রের ছোট ভাই কৃষ্ণবিহারী 'সানডে মিরর'-এর সম্পাদক। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের একজন সদস্য এবং তাঁর মুখ একেবারে সরলতার প্রতিমূর্তি।

আমি রামকমলের জীবনী রচনার জন্যে কতকটা কষ্ট স্বীকার করেছি, কেননা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এই জীবনী শিক্ষার পরিপূর্ণ। শেক্সপীঅর বলেছেন যে, কেউ

মহৎ হয়েই জন্মায়, কেউ মহত্ত্ব অর্জন করে আর কারো ওপর জোর করে মহত্ত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়। রামকমল মহৎ হয়ে জন্মাননি, তাঁর উপর জোর করে মহত্ত্ব আরোপও করা হয়নি, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল মহত্ত্ব অর্জন করা। আসুন আমরা স্বীয় চেষ্টাবলে সাধারণ অবস্থা থেকে উচ্চাবস্থায় উন্নীত এই ব্যক্তি ও আমাদের দেশের সত্যকার হিতসাধকের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করি।

আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' নামে একটি সুন্দর গ্রন্থ পাঠ করেছি। তা থেকে নিচের উদ্ধৃতিটি দেওয়া গেল।*

"আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যেও অনেকেই বৌদ্ধভাব-বিশিষ্ট শুষ্ক নিরাকারবাদী হরির মাধুর্য্যরসে বঞ্চিত। তর্ক বিতর্ক মতামতের বিবাদই তাঁহাদের সর্বস্ব। তবে ইদানীং কয়েক বৎসর হইতেই গোস্বামীশিষ্য পরমবৈষ্ণব শ্রীযুক্ত রামকমল সেনের পৌত্র ব্রহ্মানন্দ শ্রীমান কেশবচন্দ্র সেন নীরস জ্ঞানকাণ্ডের স্রোত ফিরাইয়া দিয়া নিরাকার চিন্ময় অনন্ত ব্রহ্মেতে ভক্তিপ্রেম অর্পণ করিবার শিক্ষা প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা ভক্তিপথের অনুকূল বটে, তিনি কতকপরিমাণে এ বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রকাশ্য এবং গোপনে, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে, সমাজের মধ্যে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ইহার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানীদের কঠোরতার ভাব অনেক দূর হইয়াছে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল সুবিখ্যাত রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা নগরে ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদ্য এক নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ দিতেন, হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রসিদ্ধ পিরালী বংশীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার ভার গ্রহণ করেন, এবং বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সরস উপাসনা আরাধনা প্রচলিত করেন। ইনি ভক্তিপথের বিরোধী, সুতরাং চৈতন্য মহাপ্রভুকে তেমন বড়লোক

* এই বাংলা উদ্ধৃতিটি মূল গ্রন্থে আছে।

বলিয়া জানেন না, কিন্তু ইহার জীবন ঋষিদের ন্যায় অতি মহৎ, দেখিলে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়। রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানকে দেবেন্দ্রবাবু উপসনাদি দ্বারা অনেক পরিমাণে হৃদয়গ্রাহী করত তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে কতক পরিমাণে উন্নত এবং বর্দ্ধিত করিয়া কিছু দিন সভার কার্য্য চালাইলেন। তদনন্তর রামকমল সেনের পৌত্র এই ধর্ম্ম এবং সভাকে বিধিপূর্ব্বক সংস্কার এবং কার্য্যকর করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে ইহা একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এমন কি, শিক্ষিত কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রায়ই ইহার মধ্যে আছেন। কেশবচন্দ্র সেন যে সকল ধর্ম্মমত এবং সাধনাঅনুষ্ঠান প্রচলিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিচিত্র অদ্ভুত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।"

এই সব উদ্ধৃতিতে কেশবচন্দ্র বিখ্যাত বৈষ্ণব রামকমল সেনের পৌত্ররূপে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি ব্রাহ্মদের শুষ্ক ভাবকে দূরীভূত করে তার জায়গায় ভক্তি বা প্রার্থনামূলক উপাসনা-রীতি প্রবর্তন করেছেন।

শুধু আত্মার মধ্য দিয়েই ভগবানের পূজা করা যায় প্রাচীন ভারতে এই ছিল প্রসিদ্ধ ঋষিদের শিক্ষা এবং বেদ, উপনিষদ, দর্শন ও আরও বিশেষভাবে যোগবিষয়ক পুস্তক থেকে এটা স্পষ্ট করে জানা যায়।

খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে পূজার এই উচ্চ পদ্ধতিটির ব্যাখ্যা করা উচিত এবং আমি উপনিষদ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়ার চেয়ে আরো ভাল কিছু করতে পারি না :—

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।"

ভক্তিযুক্ত ধ্যানের দ্বারা ভগবানকে খোঁজ।

" হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"

আলোর মধ্যে যা আলো, শুভ্রতায় যা স্বচ্ছ এবং আত্মার উজ্জ্বলতম ও উন্নততম প্রকোষ্ঠে যা বিরাজমান সেই জ্যোতিকে তাঁরাই জানেন যাদের আত্মোপলব্ধি ঘটেছে। তাঁরা স্বচ্ছভাবে শুভ্র জ্যোতির বিশুদ্ধ অদৃশ্য জ্যোতিকে উপলব্ধি করতে পারেন।

তাহলে ভক্ত অন্তরের মধ্যে ভগবানকে কি করে উপলব্ধি করবেন ?

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।"

ভগবৎ জ্ঞানের এক মাত্র পথ হচ্ছে প্রজ্ঞা।

"অধ্যাত্মযোগাধিগমনে দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি।"

জ্ঞানী ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের আত্মাকে ভগবানের কাছে নিয়ে এসে তাঁকে জানতে পারেন এবং স্নায়বিক হর্ষ ও বেদনা থেকে মুক্ত হয়ে যান।

"যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥"

যখন আত্মার বন্ধন ধ্বংস হয় তখন ভক্ত অমরতাকে উপলব্ধি করেন।

আর একটি উদ্ধৃতিতে আধ্যাত্মিক অবস্থা বা সমাধি, যাতে আমরা স্বর্গীয় জ্যোতি দেখি, তাকে সাম্য বলা হয়েছে এবং এটা চরমতম অবস্থা, যা অমরা এখানে লাভ করতে পারি।

"শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি।"

দিব্যজ্ঞানের সন্ধানী তাঁর আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ, করে, আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হয়ে,

আধ্যাত্মিকতা চর্চা করে ও এক অবস্থায় থেকে নিজের মধ্যে ভগবানকে দেখতে পারেন।

সেই জন্যে আমাদের যে গায়ত্রী গান ও ধ্যান করতে বলা হয়, তা হচ্ছে "এস আমরা দিব্য নিয়ন্ত্রণকারীর পূজ্য আলোর ধ্যান করি, এই ধ্যান বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালনা করুক।"

সুতরাং সবচেয়ে উচ্চ উপাসনার রূপ হচ্ছে প্রাকৃতিক থেকে সূক্ষ্ম দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ থেকে আত্মা। আমরা যতক্ষণ না আধ্যাত্মিক অবস্থায় আসি ততক্ষণ মহৎ অদৃশ্য আলোর দিকে যাওয়া যায় না। এটাই ঋষিরা করেছিলেন ও তাঁরা আমাদের এই উপদেশ দিয়েছেন এবং এটাই আমাদের কার্যত সম্পাদন করা প্রয়োজন। ভগবানের সম্বন্ধে ধারণা যত বেশী উঁচু হবে, উপাসনাও তত বেশি উন্নত হবে, আর ততই তা আত্মার সঙ্গে মিশে যাবে।

যাই হোক একথা ঠিক যে, আত্মার মধ্য দিয়ে ভগবানের পূজা খুব অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা সাধিত হতে পারে এবং সেই কারণে জনসাধারণের জন্যে উপাসনার রূপকে সহজ স্তরে নামিয়ে আনার দরকার ছিল। এই থেকেই ভক্তিরীতি উদ্ভূত হয়েছে ও এই ভক্তি হচ্ছে মন বা মস্তিস্কের একটা অভিভূত বা উন্নত অবস্থা, যার মধ্যে আত্মা বিষয়ী হয়ে থাকে না। এ থেকেই অসংখ্য সান্ত ভগবান ও বহু ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভক্তি অনুগামীদের মধ্যে প্রতিমাপূজক হলেও ধার্মিক ব্যক্তি অনেক ছিলেন। মনস্তাত্ত্বিকতার দিক দিয়ে বিচার করলে ভক্তি মন থেকে জন্মায় এবং ভক্তি যে অভিভূত অবস্থার উদ্ভব করে তা থেকেই এটা প্রমাণত

হয়। এখন মনের সকল অবস্থা আত্মার একটি স্থায়ী অবস্থা বা প্রকৃত আধ্যাত্মিক অবস্থায় অবশ্যই মেশা উচিত এবং এই সময় গীতার উক্তি অনুসারে, "জ্ঞান সূর্যের মহিমায় দীপ্তি পায় ও দেবতার আবির্ভাব ঘটায়।" যোগ অনুসারে মনের বিভিন্ন অপ্রগতিশীল অবস্থাগুলি হচ্ছে,—

১ ॥ প্রাণায়াম—ভাবাবেশ বা তন্ময়তা

২ ॥ প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়সমূহের সাময়িক বিরতি

৩ ॥ ধারণা—স্বপ্নচারী অবস্থা

৪ ॥ ধ্যান—ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু শ্রবণ বা দর্শনের অবস্থা

৫ ॥ সমাধি—আধ্যাত্মিক অবস্থা

সুইডেনবর্গ বলেছেন, "মানুষ যতই জ্ঞানী হবে, ততই সে দেবতার পূজক হবে।"

ইঅং যথার্থই বলেছেন,—

"দেবতাকে বিশ্বাস করার মধ্যে আনন্দের সূচনা;
দেবতার পূজায় আনন্দের বৃদ্ধি;
দেবতাকে ভালবাসায় আনন্দের পূর্ণতাপ্রাপ্তি।"

আত্মাতেই "আনন্দ পূর্ণতা পায়।"

ভক্তি বা গভীর অনুরক্তিকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এটা একটা অনুভূতি, তবে তা শাস্ত্র জ্ঞান নয় এবং সেই জন্যে তা কমবেশি আণবিক। বৈষ্ণবদের শেষ আশ্রয় শ্রীমৎ ভাগবতে যে ভক্তিকে অধিকতর ফলপ্রদ বলে বিবেচনা করা হয় তাকে দুরকমের, যেমন—সগুণ ও নির্গুণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং উপাসনারীতি হচ্ছে, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। কর্ম নিয়ে যায় ভক্তিতে এবং ভক্তি নিয়ে যায় জ্ঞানে।

ভক্তি হচ্ছে নিঃসন্দেহে এমন একটি চর্চা যা অগ্রগতির দিকে আমাদের নিয়ে যায়, কিন্তু তা কোনো চরম অবস্থা নয়। জ্ঞানতত্ত্ব রয়েছে ভগবানের প্রতিরূপ আত্মায় এবং উপাসক যতক্ষণ না সমাধি অবস্থায় উপনীত হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুক্তি বা নির্বাণ নেই। ভক্তি হচ্ছে একটি পরমোৎকৃষ্ট প্রস্তুতিমূলক অবস্থা—পুরুষ ও রমণী নির্বিশেষে জনসাধারণের অধিকাংশের পক্ষেই এই উপাসনারীতি খুবই উপযুক্ত এবং যদি গভীর অনুরক্তি সহকারে অভ্যাস করা হয় তবে এই রীতি ক্রমশঃ উচ্চতর অবস্থায় নিয়ে যায়।

এইভাবে ভক্তি অবস্থা ও সমাধি অবস্থা অথবা মনের অবস্থা ও আত্মার অবস্থার মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি ভক্তিরীতির উপাসনা, যার জন্যে উপর্যুক্ত গ্রন্থের লেখক তাঁর উপর দোষারোপ করেছেন, তার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা না করে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তা এই যুক্তির জন্যে যে, ভক্তি উপাসনা আমাদের সেই পরাজ্ঞান দেয় না, যা আত্মার উপাসনা দিয়ে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ ভক্তির বিরোধী নন। অপরপক্ষে তিনি এর ফলপ্রসূতা এত অধিক পরিমাণে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি নিজেই তাঁর ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যায় বলেছেন,—

"ভক্তিযোগই পরমযোগ। ধর্মপথের যে জ্ঞান অতি দূরবর্তী বোধ হয়, ভক্তিপ্রসাদাৎ নিমেষমাত্রে তাহা নিকট হইয়া আইসে।" *

আসুন আমরা আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে পার্থক্যকে অন্তরঙ্গভাবে পর্যবেক্ষণ করি। অনাত্মা আত্মার ক্রমোন্নতির

* এই উদ্ধৃতিটি মূল গ্রন্থে আছে।

উপায় হিসাবে উদ্দিষ্ট। এটি হচ্ছে কোনো লক্ষ্যের একটি পথ। যখন আমরা আমাদের ইচ্ছামতো অনাত্মা যা কিছু নির্দেশ করে তা প্রয়োগ করি, তখন আমরা যেন না ভুলি যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের আত্মার উন্নতি করা। তাহলেই আমরা এমন একটা অবস্থায় গিয়ে পৌঁছব, যাতে বিজ্ঞলোকের উপলব্ধি জন্মায়—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

কিন্তু আমরা সকলে জানি যে, কোন গুরু, তিনি যতই উন্নত হোন না কেন, যদি স্বয়ং প্রস্তুতিমূলক অবস্থার মধ্যে দিয়ে না যান তবে অপরকে উন্নত করতে পারেন না। ভক্তি উপাসনা নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রস্তুতিমূলক ও জনপ্রিয় উপাসনা। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়েই জ্ঞানযোগ ও ভক্তি-যোগ পূর্ণভাবে বোঝেন। যখন আদি সমাজের প্রিয় প্রধান আচার্য ভক্তিযোগের অমৃতের সাহায্যে সুমধুর জ্ঞানযোগ প্রচার করছেন, সেই সময় প্রিয় কেশবচন্দ্র জনসাধারণের ভক্তিযুক্ত অনুভূতি উদ্দীপ্ত করছেন এই ভেবে যে, এটা জ্ঞানযোগে নিয়ে যাবে। আমরা এই দুইজন গুরুর কাছেই কৃতজ্ঞতা অনুভব করি এবং তাঁদের সাফল্য কামনা করি। বহু বৎসর ধরে স্ত্রীশিক্ষা, সুলভ সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার উন্নয়ন এবং অন্যান্য সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির বিষয়ে তাঁর পরিশ্রমের জন্যেও কেশবচন্দ্র আমাদের কৃতজ্ঞ ধন্যবাদের পাত্র।

আমি এই প্রার্থনা করি যে তিনি ও সেনবংশের অন্য সকলে ভগবানের আশীর্বাদে তাঁদের জন্মভূমির কল্যাণসাধনের জন্যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন ও তাঁদের বংশধারা অব্যাহত

থাকুক। এইভাবে সত্যকার সৎ ও মহান পুরুষ রামকমল সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার টানছি।

LIFE,

DEWAN RAMCOMUL SEN

PEARY CHAND MITTRA,

AUTHOR OF "THE BIOGRAPHICAL SKETCH OF DAVID HARE,"
"SPIRITUAL STRAY LEAVES,"
AND
"STRAY THOUGHTS ON SPIRITUALISM."

CALCUTTA:
PRINTED AND PUBLISHED BY I. C. BOSE & Co.
249, BOW-BAZAR STREET.

1880.

[Price One Rupee.]

মূল গ্রন্থের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি

প্রসঙ্গকথা

'প্রসঙ্গকথা'য় বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং আকর্ষণীয় প্রসঙ্গগুলিই একমাত্র আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গাবলীর পার্শ্বস্থ অঙ্ক বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠানির্দেশক। এবং আলোচনায় প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠাঙ্কগুলিই উল্লিখিত হয়েছে। অন্যান্য পৃষ্ঠাঙ্ক নির্ঘণ্টে দ্রষ্টব্য। তারকাচিহ্নিত প্রসঙ্গগুলি 'গ্রন্থমালা'র সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক লিখিত।

সেনেরা কায়স্থ ছিলেন। ১*

পাল রাজাদের (খৃষ্টীয় অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দী) পর যে-রাজবংশ বাংলাদেশে রাজত্ব করতে শুরু করেন ইতিহাসে তা সেনবংশ নামে পরিচিত। একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কোন সময়ে জনৈক সামন্তসেন কিংবা তাঁর কোন পূর্বপুরুষ পিতৃভূমি কর্ণাটদেশ (কানাড়ী-ভাষী মহীশূর-হায়দ্রাবাদ অঞ্চল পরিত্যাগ ক'রে বাংলাদেশে গঙ্গাতীরে (রাঢ় বা বর্ধমান বিভাগের কোথাও) এসে বসবাস করতে থাকেন। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেনই সম্ভবত একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন এবং হেমন্তসেন-তনয় বিজয়সেনের সময় (আ ১০৯৫-১১৫৮ খৃষ্টাব্দ) সেনবংশ ক্ষমতা ও গৌরবের পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়। তাঁর সময় সেনরাজ্য একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়সেনের পুত্র ও পৌত্র বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন এই বংশের দুজন কীর্তিমান রাজা। শেষোক্ত জন বিখ্যাত পুরুষ হ'লেও তাঁর সময়েই সেনবংশ মুসলমানদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়ে অধঃপতনের পথে অনেকখানি এগিয়ে যায়। লক্ষ্মণসেনের পৌত্রদ্বয় বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন বিক্রমপুরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং অতঃপর বিক্রমপুরই সেনদের রাজধানী হয়ে ওঠে। এখানে সেনরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

সেনরাজারা ছিলেন ক্ষত্রিয়, কায়স্থ নন। তাঁদের লেখমালায় তাঁরা ব্রহ্মক্ষত্রিয়, কর্ণাটক্ষত্রিয় বা শুধু ক্ষত্রিয় রূপে বর্ণিত হয়েছেন। ডি. আর ভাণ্ডারকর 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'ব্রহ্মক্ষত্রি' নামে এক শ্রেণীর হিন্দুর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন; এবং তাঁর মতে যে সব ব্রাহ্মণ পরে ক্ষত্রিয় হন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যকর্মের পরিবর্তে ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁরাই কালক্রমে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা ব্রহ্মক্ষত্রি রূপে পরিচিত হন (Indian Antiquary, 1911, p. 35, ননীগোপাল মজুমদার সম্পাদিত Inscriptions of Bengal, vol. III; p. 44, fn. 3 দ্রষ্টব্য)। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার

প্রাচীন চম্পা রাজ্যের (আধুনিক আনাম) কয়েকটি লেখমালায় কয়েকজন রাজার 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' রূপে বর্ণিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন (Ancient Indian Colonies in the Far East, vol. I, pp 215-16)। শ্রীযুক্ত মজুমদার সেনরাজাদের জাতিতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন যে, কর্ণাটদেশের ধারওয়াড় জেলায় (বর্তমানে মহীশূরভুক্ত) কয়েকটি পুরানো লেখতে 'সেন' পদবীধারী কয়েকজন জৈন আচার্যের নাম পাওয়া যায় এবং এই আচার্যদের একজনের নাম বীরসেন। এখানে আকর্ষণীয় তথ্য এই যে, বিজয়সেনের দেওপাড়া লেখতে বীরসেন নামে সেনরাজাদের একজন পূর্বপুরুষের কথা পাওয়া যায়। অবশ্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার উক্ত জৈন আচার্যদের সঙ্গে সেনবংশীয়দের যোগ সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় নন এবং তাঁর মতকে অনুমানের পর্যায়েই রাখতে চান। সংক্ষেপে, সেনরা জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং কর্ণাটদেশ থেকে বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সেনবংশীয়দের রাজত্ব একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal, vol. I অবশ্যদ্রষ্টব্য। ননীগোপাল মজুমদার সম্পাদিত Inscriptions of Bengal, vol. III গ্রন্থে সেনরাজাদের লেখমালা পাওয়া যাবে। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থেও সেনরাজাদের রাজত্ব ও কীর্তিগাথা বিবৃত হয়েছে।

বৈদ্যজাতি বৈশ্য মাতা ও ব্রাহ্মণ পিতার সন্তান। ১*

বৈদ্যদের দু'টি সুপরিচিত কুলজীগ্রন্থ রামকান্ত-রচিত 'কবিকণ্ঠহার' (রচনাকাল ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ভরত মল্লিক-প্রণীত 'চন্দ্রপ্রভা' (রচনাকাল ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, বর্তমান গ্রন্থে প্যারীচাঁদ মিত্র ভরত মল্লিকের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেননি)। উভয় কুলজীতে বৈদ্যদের পূর্বপুরুষদের তালিকায় আদিশূর এবং বল্লালসেনকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু

ব্রাহ্মণ কুলজীতে এ মতের সন্ধান মেলে, কিন্তু কায়স্থ কুলজীগুলি এ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থগুলির মধ্যে ইতিহাস ও কল্পনা এমনভাবে মিলে-মিশে আছে যে বর্তমান অবস্থায় তা থেকে নির্ভুলভাবে ঐতিহাসিক উপাদান আহরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। কুলজীগ্রন্থসমূহের ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে ইতিহাস-রচয়িতারা একমত নন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের বৈদ্যদের উৎপত্তি সম্পর্কে শেষ কথা বলা দুঃসাধ্য।

প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যগ্রন্থসমূহে অম্বষ্ঠ আম্বষ্ঠ (এরা Abastanoi, Sabarcae, Sabagrae, Sambastai প্রভৃতি নামে প্রাচীন গ্রীক-রোমীয় লেখকগণ কর্তৃক উল্লিখিত পাঞ্জাবদেশীয় জাতির সঙ্গে অভিন্ন বলে পণ্ডিতদের ধারণা) প্রভৃতি একটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিচ কোন কোন পালিগ্রন্থে অম্বট্‌ঠ বা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে বর্ণিত হয়েছে, সংস্কৃতে রচিত ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থসমূহ কিন্তু অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তানরূপে উল্লেখ করেছে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৭ সংখ্যক শ্লোকে চিকিৎসাকে অম্বষ্ঠের পেশা বলা হয়েছে। মনু-সংহিতাদি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থসমূহে স্বতন্ত্র জাতি বা বর্ণ হিসাবে 'বৈদ্য'দের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু 'উশনস্‌স্মৃতি'র মতো কিছু অর্বাচীন স্মৃতিগ্রন্থে ব্রাহ্মণপুরুষ ও ক্ষত্রিয়নারীর সন্তানরূপে 'ভিষক্' নামীয় একটি জাতি এবং সে জাতি 'বৈদ্যক' অভিধায় উল্লিখিত কথা পাওয়া যায়। যদি এই 'ভিষক্-বৈদ্যক'কে প্রাচীন অম্বষ্ঠদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায়, তবে অম্বষ্ঠ বৈদ্যদের পূর্বপুরুষ হিসাবে পরিগণ্য হতে পারেন। লক্ষণীয় এই, ভরত মল্লিক নিজেকে বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ উভয় পরিচয়েই ভূষিত করেছেন এবং তাঁর 'চন্দ্রপ্রভা'য় বৈদ্য ও অম্বষ্ঠের অভিন্নতা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। মনে হয়, বাংলার বৈদ্যগণ প্রাচীন অম্বষ্ঠদেরই একটি শাখা, যদিচ প্রাচীন বাংলাদেশে অম্বষ্ঠদের বসবাসের কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কিছুসংখ্যক কায়স্থ নিজেদের অম্বষ্ঠ ব'লে পরিচয় দেন এবং 'সূতসংহিতা'য় আবার

মাহিষ্যদের অম্বষ্ঠ বলা হয়েছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায়, অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যদের অভিন্নতাকে অনুমানের পর্যায়ে রাখাই ভালো।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' (বাংলাদেশের ধর্ম ও সমাজ-জীবন পর্যালোচনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক ; ডক্টর রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা এর রচনাকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মনে করেন—Studies in the Upapuranas, Vol.II, p. 461 দ্রষ্টব্য) ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সংমিশ্রণের ফলে জাত 'সংকর'দের উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। অম্বষ্ঠরা 'উত্তম সংকর'রূপে বর্ণিত এবং চিকিৎসা তাদের বৃত্তি হওয়ায় তারা 'বৈদ্য' ব'লে পরিচিত। কিন্তু 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'ও (বাংলাদেশের জাতিতত্ত্বের ব্যাপারে 'বৃহদ্ধর্মে'র সঙ্গে অনেকাংশে একমত) বৈদ্যদের অম্বষ্ঠ থেকে স্বতন্ত্র ব'লে অভিহিত করেছে এবং বৈদ্যদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছে, সূর্যপুত্র অশ্বিনীকুমারের ঔরসে এক ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে বৈদ্যদের আদিপুরুষের জন্ম।

বাংলাদেশের বৈদ্যরা অম্বষ্ঠদের উত্তরপুরুষ কি না এ সম্পর্কে কিছু বলা না গেলেও এ বিষয়ে সংশয় নেই যে, বৈদ্যদের আদি ও মূল বৃত্তি ছিল চিকিৎসাকর্ম। কিন্তু কবে এই চিকিৎসা-উপজীবীরা স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে পরিগণিত হলেন বর্তমান ক্ষেত্রে তা বলা দুরূহ।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের দাক্ষিণাত্যের তিনটি লেখাতে (Epigraphia Indica, XVII, pp. 291-309, ও VIII, pp. 317-321 এবং Indian Antiquary 1893, pp. 578 ৮৮ দ্রষ্টব্য) স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বৈদ্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লোকেরা সামাজিক মান-মর্যাদার অধিকারী ছিল এবং তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণের মর্যাদা পেতেন। কিন্তু বাংলাদেশে বৈদ্যদের অস্তিত্বের প্রমাণ দ্বাদশ শতাব্দীর আগের কোন তথ্যে পাওয়া যায় না। ভাটেরা তাম্রলেখতে 'বৈদ্যবংশ-প্রদীপ' রূপে বর্ণিত জনৈক বনমালী করের উল্লেখ থেকে মনে হয় বাংলাদেশে বৈদ্যদের ইতিহাস দ্বাদশ শতাব্দীর খুব আগে নিয়ে যাওয়া যায় না।

অধিকতর তথ্যের জন্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত History of Bengal, vol. I (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) পৃ. ৫৬৮, ৫৮৯-৯১, ৬৩২-৩৩, উমেশচন্দ্র গুপ্তর 'জাতিতত্ত্ববারিধি', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬, এবং 'বিশ্বকোষ' ('বৈদ্যজাতি', পৃ. ৫২৮-৯৪) দ্রষ্টব্য।

কোলব্রুক। ১

হেনরী টমাস কোলব্রুক একজন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ্ ছিলেন। ১৭৬৫, ১৫ই জুন লণ্ডনে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে বোর্ড অব একাউন্টস্ কার্যালয়ে নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন। এখানে সংস্কৃত শিক্ষায় তাঁর অনুরাগ জন্মে। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস্' পত্রিকায় তাঁর ভারতবিদ্যা সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের 'বিবাদভঙ্গার্ণব' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে কোলব্রুক *A Digest of Hindu Law* গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য পরিদৃষ্ট হয়। তিনি ফোর্ট উইলিঅম কলেজে হিন্দু আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামত আদালতের প্রধান বিচারপতি হন। তিনি 'বোর্ড অব রেভিনিউ'-এর সভাপতি, বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। তিনি লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের মতে কোলব্রুক "The founder and father of true Sanskrit scholarship in Europe." তিনি শেষ বয়সে অন্ধত্ব প্রাপ্ত হন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : Grammar of the Sanskrit Language, On the Philosophy of the Hindus, Miscellaneous Essays ইত্যাদি।

বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্র। ২*

বাংলাদেশের কোন কোন কুলজীগ্রন্থে বল্লালসেনকে আদিশূর নামক এক গৌড় রাজার দৌহিত্র বা দৌহিত্রবংশোদ্ভব (যেমন, 'রাজ্ঞঃ সপ্তম সন্তানস্য দৌহিত্রোঽভূদ্ বল্লালাখ্যঃ'—'রাজ্ঞঃ' অর্থাৎ আদিশূরের, Epigraphia Indica vol. XV, p. 279-এ উদ্ধৃত) বলা হয়েছে। কুলজীগ্রন্থের সাক্ষ্য অনুসারে, উপরি-উক্ত আদিশূর বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যে কনৌজ থেকে পাঁচ ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন (যেমন, 'আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান্। আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্র সমুদ্ভবান্॥'—রমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌড়রাজমালা' পৃ. ৫৭ দ্রষ্টব্য)। আদিশূর কোন্ সময়ে সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তিনি কবে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন, বা আদিশূর নামে আদৌ কোন রাজা বাংলাদেশে রাজত্ব করতেন কি না তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে। অনেকের মতে কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণ আনয়নের কোন সঙ্গত হেতু নেই, কারণ অষ্টম-নবম-দশম শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি দেখা দিলেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম যে একেবারে লোপ পায়নি তার সাহিত্যও-লেখগত প্রমাণ আছে। আদি-শূরের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে তাঁদের কারো কারো সুস্পষ্ট মন্তব্য : "ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশূর কর্তৃক সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া আদিশূর বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। যতদিন না কোনও তাম্রশাসন বা শিলালিপি দ্বারা এই সংশয় অপসারিত হয়, ততদিন পরস্পর-বিরোধী কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে আদিশূরের ইতিহাস উদ্ধারের যত্ন বিড়ম্বনামাত্র" (রমাপ্রসাদ চন্দ : 'গৌড়রাজমালা', পৃ. ৫৯)। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার আদিশূরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তত সংশয়াপন্ন নন ; তাঁর মতে : No positive evidence has yet been obtained of his existence, but we have undoubted references to

a Sura family ruling in West Bengal in the eleventh century. Adisura may or may not be an historical person, but it is wrong to assert dogmatically that he was a myth, and to reject the whole testimony of the *kulajis* on that ground alone. History of Bengal (Dacca University), vol. I, p. 630. অর্থাৎ আদিশূর সম্পর্কে যতদিন না সুনিশ্চিত নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ততদিন বল্লালসেনের সঙ্গে আদিশূরের আদৌ কোন সম্পর্ক কখনো ছিল কি না তা বলা দুরূহ। আমার মনে হয়, বল্লালসেন মায়ের দিক দিয়ে শূরবংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিশেষত যখন সেন ও শূর বংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের লেখগত প্রমাণ আছে, যেমন, বিজয়সেনের সহধর্মিণী বিলাসদেবী ছিলেন, 'শূরকুলাম্ভোধি-কৌমুদী', Inscriptions of Bengal, vol. III, পৃ. ৬২ দ্রষ্টব্য)। তবে একটা কথা স্মরণে রাখা ভালো, ভারতবর্ষের মতো যে সব প্রাচীন দেশের সভ্যতা এখনও জীবন্ত, যে সব দেশের সভ্যতার ধারা প্রাচীনকাল থেকে এখনও বহমান, সে সব দেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে সব সময় পাথুরে প্রমাণের উপর একান্ত নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। কুলজীগ্রন্থের মূল্য ও ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য আস্থাবান ছিলেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনাও করেছেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর আলোচনার জন্যে, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' (সমস্ত খণ্ড) এবং দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের আলোচনার জন্য বৈশাখ ১৩৪৭ সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' দ্রষ্টব্য।

জব চার্নক। ২

জব চার্নক ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ইংরেজের বাণিজ্যকুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। সে সময়ে বাংলার নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ

হওয়ায় চার্নক হুগলী পরিত্যাগ করে সুতানুটী গ্রামে চলে আসেন। এখানেও নবাব সৈন্যের আক্রমণের ভয়ে তিনি মাদ্রাজে পালিয়ে যান। পরে উভয় পক্ষের সন্ধি হলে বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ চার্নককে বাংলায় আনেন। ১৬৯৫ সালে চার্নক কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুরে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৯৬ সনে তিনি ফোর্ট উইলিঅম দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৬৯৮ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। জব চার্নক সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন বইয়ে ইতস্তত ছড়ানো আছে। Martineau-র Memoire (তিন খণ্ড), C. R. Wilson-এর Early Annals of Bengal এবং Yule-সম্পাদিত Hedge's Diary (দু খণ্ড) থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হ'তে পারে।

ক্লাইভ। ৫

রবার্ট ক্লাইভ ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। আঠার বছর বয়সে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরানীর কাজ নিয়ে ভারতে আসেন। তিনি কিছুকাল দক্ষিণ ভারতের সৈনিক বিভাগে কাজ করেন। ১৭৫৬ সনে মাদ্রাজ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, এবং ঐ সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদ তাঁকে দেওয়া হয়। পলাশীর যুদ্ধের শেষে তিনি নবাবের শক্তিকে চিরতরে বিনষ্ট করতে সমর্থ হন। এই বছর বঙ্গের নবাব সিরাজদ্দৌলার সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করে নবাবকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তথাকথিত সুবিধাজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। তিনি কোম্পানীর পক্ষে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন (১৭৬৫)। ১৭৭৪ সনে ইংলণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়।

লর্ড ক্লাইভের জীবন ও কার্যাবলীর জন্য George Forrest-এর Life of Lord Clive (দু খণ্ড) অবশ্যপাঠ্য। H. Dodwell-এর Dupleix and Clive এবং S. C. Hill-এর Bengal in 1756-57

(তিন খণ্ড) গ্রন্থেও প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে। পলাশীর যুদ্ধ ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর জন্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal (Dacca University), vol. II দ্রষ্টব্য।

নবকৃষ্ণ। ৫

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর জন্ম ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি উর্দু, ফারসী, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের ফারসী-শিক্ষক ছিলেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুন্সী পদে নিযুক্ত হন। হেস্টিংসের সময় নবকৃষ্ণ সমগ্র সুতানুটীর তালুক পান। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালংকার প্রমুখ সেকালের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ তাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৭৯৭ সালের ২২ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। N. N. Ghose-এর Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur দ্রষ্টব্য।

রামদুলাল দে বা দেব। ৫

পরবর্তীকালে রামদুলাল সরকার নামে আখ্যাত। প্রথম জীবন খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। নিজ প্রতিভা ও কর্মশক্তির গুণে রামদুলাল পরবর্তী জীবনে বিস্তর ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। ইউরোপীয় ও মার্কিনী বণিকদের সঙ্গে মিলে তিনি ব্যবসায়কর্মে লিপ্ত হন। তাঁর সততা ও কর্মনৈপুণ্য হেতু তাঁরা তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ানিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত বণিক তাঁকে জর্জ ওয়াশিংটনের একটি প্রতিমূর্তি উপঢৌকন প্রদান করেন।

এ প্রসঙ্গে Girish Chandra Ghosh-এর Life of Ramdulal Dev এবং Lokenath Ghosh-এর Indian Chiefs, Rajas, Zeminders etc. vol. II দ্রষ্টব্য।

ফোর্ট উইলিঅম কলেজ। ৫

লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আগ্রহাতিশয্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজটি স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, যে-সব যুবক সিবিলিয়ান বিলাত থেকে নিযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আসত আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষাগুলির সঙ্গে তাদের পরিচয় স্থাপন করা। এতদুদ্দেশ্যে দেশের নানা স্থান থেকে পণ্ডিত সংগ্রহ করে অধ্যাপনাকার্যে নিয়োজিত করা হয়। সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক-পদে পাদ্রী উইলিয়াম কেরীকে নিযুক্ত করা হয়। হিন্দু আইনের অধ্যাপক হন কোলব্রুক। কলেজের উদ্যোগে দেশীয় ভাষায় নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ফলে ইংরেজ সিবিলিয়ানগণ প্রাচ্যভাষাগুলির মহিমা উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন। ১৮৫৩ সন পর্যন্ত এই কলেজের অস্তিত্ব বজায় ছিল।

এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের Dawn of New India (১৯২৭), Lt-Col. Ranking-এর History of the College of Fort William, (*Bengal Past and Present*, 1911, 1920, 1921, 1922), Capt Thomas Roebuck-এর Annals of the College of Fort William, etc. (1819), The College of Fort William, *Calcutta Review*, vol. V পৃ. 86–123 দ্রষ্টব্য।

নকুড় ধর। ৫

নকুড় ধর বা নকু ধরের আসল নাম লক্ষ্মীকান্ত ধর। অষ্টাদশ শতকের একজন প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার বা শ্রেষ্ঠী এবং জোড়াসাঁকো পোস্তা রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামে। মুসলমান শাসনকর্তাদের উৎপীড়ন এড়াবার জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মীরা যখন কলিকাতায় আশ্রয় নেন, তখন থেকে সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক প্রধানেরাও এস্থানে আসতে থাকেন।

জনশ্রুতি এই, লক্ষ্মীকান্ত একজন নিমজ্জমান শ্বেতাঙ্গকে গঙ্গাবক্ষ থেকে উদ্ধার করে তাঁকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেন এবং তাঁর কাছ থেকে কাজ চালাবার মতো কিছু ইংরেজী শিখে নেন। লক্ষ্মীকান্ত ইংরেজ ও দেশীয় বণিকদের মধ্যে দোভাষী হয়েছিলেন। কোম্পানির বিপৎকালে তিনি লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁকে 'মহারাজা' উপাধি প্রদানের কথা হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। দৌহিত্র সুখময় রায়ের অনুকূলে ঐ উপাধির জন্য সুপারিশ করেন। মহারাজা সুখময় রায় 'বেঙ্গল ব্যাঙ্ক'-এর প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর। তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা দূরীকরণার্থে সুখময় রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে উলুবেড়িয়া থেকে পুরীর সিংহদ্বার পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করান। দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজা বৈদ্যনাথ রায়। ৬

মহারাজা সুখময় রায়ের তৃতীয় পুত্র। বৈদ্যনাথ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিবিধ সৎকর্মে তাঁর দান প্রচুর। সে যুগে শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষা ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বৈদ্যনাথ অন্যতম। তিনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে হেদুয়ার পূর্বদক্ষিণ কোণে সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য লেডিস্ সোসাইটির হাতে কুড়ি হাজার টাকা অর্পণ করেন। এই সনেই হিন্দু কলেজের আর্থিক বিপর্যয় ঘটে এবং বৈদ্যনাথ তখন প্রচুর অর্থ দিয়ে এর সচ্ছলতা আনেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন বা সরকার পোষিত শিক্ষা কমিটিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন। ধর্মতলা নেটিভ হাসপাতাল তাঁর কাছ থেকে পায় ত্রিশ হাজার টাকা। ১৮৪৪ সনে সরকারের কাছে বৈদ্যনাথ একখানি স্মারকলিপি পেশ করেন।

তাতে বিবিধ সৎকর্মে জোড়াসাঁকো রাজপরিবারের দানের দফাওয়ারি উল্লেখ আছে। বৈদ্যনাথের মৃত্যু হয় ১৮৫১, ৩ ডিসেম্বর।

নৃসিংহচন্দ্র রায়। ৬

সুখময় রায়ের পঞ্চম বা কনিষ্ঠ পুত্র রাজা নৃসিংহ চন্দ্র রায়ও দানশীলতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ও তদীয় অগ্রজ রাজা শিবচন্দ্র রায় শিক্ষা বিস্তারকল্পে তদানীন্তন শিক্ষা কমিটিকে এক লক্ষ চার হাজার টাকা দেন। নৃসিংহচন্দ্র কাশীপুর-দমদম রাস্তা তৈরি করান চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে এবং বাংলার বাইরে তাঁর প্রচুর দানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

জোড়াসাঁকো রাজপরিবার সম্পর্কে (নকুড় ধর, বৈদ্যনাথ ও নৃসিংহ সম্পর্কে) বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৫। এ ছাড়া, Maharaja Sukhomoy Roy Bahadur and his family (1929)—Beni Madhub Chatterjee, revised by Tomonash Chandra Dasgupta; Old Calcutta families—1. The Jorasanko Raj; Their philanthropic Activities (*Calcutta Municipal Gazette*—11th Anniversary member) by Brojendra Nath Banerjee; এবং Jogesh Chandra Bagal-এর Women Education in Eastern India.

ডবলু. সি. ব্ল্যাকোআর। ৭

ব্ল্যাকোআর ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৪ সাল নাগাদ কলকাতায় কাজ নিয়ে আসেন। কলকাতার পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট-পদে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। বিবিধ বিদ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগপর্বে যে কমিটি গঠিত হয় তিনি তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ৯৫ বৎসর বয়সে ১৮৫৩,

১৮ অগষ্ট পরলোক গমন করেন। কলকাতা দর্জিপাড়ায় 'ব্ল্যাকোআর স্কোয়ার' তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

দ্রষ্টব্য: 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ, ৪১৩ এবং যোগেশচন্দ্র বাগলের 'ইংরেজী শিক্ষার গোড়ার কথা, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা', বাঙলার শিক্ষা, ফাল্গুন ১৩৫২।

ডাঃ এইচ, এইচ, উইলসন। ৮

হোরেস হেম্যান উইলসনের জন্ম ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ১৮০৮ সনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সার্জন হয়ে এদেশে আসেন। তিনি ১৮১০ সনে কলকাতা মিণ্ট-এ 'অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট অ্যাসে মাষ্টার' নিযুক্ত হন। কোলব্রুকের সহায়তায় ভারতবিদ্যায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উইলসন এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮১৯ সনে বেনারস সংস্কৃত কলেজে পরিদর্শক নিযুক্ত হয়ে কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত 'জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাক্শন'-এর তিনি সম্পাদক পদে ব্রতী হন। তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮২৪)। উইলসন হিন্দু কলেজেরও 'ভিজিটর' বা পরিদর্শক ছিলেন। এই কলেজের পুনর্গঠনে ও ক্রমোন্নতিতে তাঁর সহায়তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৩৩ সনের জানুআরী মাসে কলকাতা ত্যাগ করেন। স্বদেশে ফিরে তিনি অক্সফোর্ডের সংস্কৃতের বোডেন প্রোফেসর নিযুক্ত হন। ১৮৩ সনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের পদ লাভ করেন। ১৮৬০, ১৮ই মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। উইলসনের ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদ, Hindu Theatre প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। উইলসন সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ, ১৭-১৯-এ কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

এশিয়াটিক সোসাইটি । ৮, ৬১

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ স্যার উইলিয়ম জোন্স-এর উদ্যোগে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এশিয়ার 'মানুষ ও প্রকৃতি সংক্রান্ত' যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচ্যবিদ্যা আলোচনা ও গবেষণার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রসিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal (1784-1883) ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র'।

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুলসোসাইটি ।৯,৫০

এ দু'টি প্রতিষ্ঠানই পরস্পরের পরিপূরক। প্রথমটি স্থাপিত হয় ১৮১৭ জুলাই মাসে। দ্বিতীয়টির প্রতিষ্ঠাকাল সেপ্টেম্বর, ১৮১৮।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রকাশ এবং সরবরাহের ভার নেয় 'স্কুল বুক সোসাইটি'। এর কর্মকর্তৃ-সভায় ছিলেন কয়েকজন সরকারী ও বেসরকারী গণ্যমান্য ইউরোপীয় এবং দেশীয় ব্যক্তি। প্রথমাবধি যোগ্য লেখকদের দ্বারা বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, উর্দু, বিভিন্ন ভাষায় বিবিধ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার আয়োজন করা হয়। তাদের ভিতরে ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। দেশীয়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন প্রমুখ। সরকার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতি মাসে সোসাইটিকে পাঁচশত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। সে যুগে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের নিমিত্ত কোন সরকারী ব্যবস্থা ছিল না। অর্ধ শতাব্দীরও উপর 'স্কুল বুক সোসাইটি' এই কার্য

সম্পাদন করে। সোসাইটির আদর্শে ঢাকায় ও এলাহাবাদে ‘স্কুল বুক সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পাঠ্যপুস্তক গ্রাহ্য করতে হলে দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতি আবশ্যক। এই বিবেচনায় ‘স্কুল বুক সোসাইটি’র কয়েকজন সদস্য মিলে ‘স্কুল সোসাইটি’ স্থাপন করেন। দেশীয় পাঠশালা সংস্কার, আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন, স্বতন্ত্র ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা এই তিনটি উদ্দেশ্যের দিকে সোসাইটি প্রথম থেকে অবহিত হন। এটিও ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিমাসে পাঁচশত টাকা সরকারী সাহায্য পেতে আরম্ভ করে। ইউরোপীয় সম্পাদকরূপে ডেভিড হেয়ার (প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে) এবং দেশীয় সম্পাদকরূপে রাধাকান্ত দেব কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কারকল্পে সোসাইটির আনুকূল্যে যে সকল উপায় অবলম্বন করেন তার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্ট ব্যাপ্তিলাভ করে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় হেতু সোসাইটির কার্য সবিশেষ সংকুচিত হয়। সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে ডেভিড হেয়ার পরিচালিত পটলডাঙ্গা ইংরেজী স্কুলটি শুধু রক্ষা পায়। নানা পরিবর্তনের পর এই বিদ্যালয় হেয়ার স্কুলে পরিণত হয়েছে।

বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: Charles Lushington-এর The history, design and present state of religious, benevolent and charitable Institutions founded by the British in Calcutta and its Vicinity (1824), *Bengal Past & Present*, July-December 1962, ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ (প্রথম খণ্ড), এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের ‘বাংলার জনশিক্ষা’ (বিশ্বভারতী)।

জেনারেল কমিটি। ৯

পুরা নাম ‘জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাক্শন’। সরকার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে এই কমিটি স্থাপন করেন এবং শিক্ষা-

ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্পূর্ণ ভার এর উপর ছেড়ে দেন। এই কমিটির প্রথম কাজ—সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। ১৮২৪ সালের ১লা জানুআরী এই কলেজ স্থাপিত হয়। কলকাতা মাদ্রাসাও কমিটির আওতার মধ্যে এল। ক্রমে গবর্নমেন্ট কর্তৃক সরাসরিভাবে এবং এর আনুকুল্যে বিভিন্ন স্থলে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে সমগ্র উত্তর ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার ভার দেওয়া হয় এই কমিটির উপর। ১৮৪০ সনের পর থেকে কমিটির সীমানা সঙ্কুচিত হয়। অতঃপর শুধু বঙ্গ প্রদেশের (বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম) শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের ভারই মাত্র এর উপর ন্যস্ত থাকে। ১৮৫৫ সনের পূর্ব পর্যন্ত এই কমিটি সরকারের অধীনে থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। ঐ সনে এটি উঠে যায় এবং সরকার শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আর এর পরিচালনার ভার দেন শিক্ষা-অধিকর্তার (D. P. I.) উপর। কমিটির প্রথম সভাপতি সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জে, এইচ, হ্যারিংটন এবং সম্পাদক ডাঃ হোরেস্ হেম্যান উইলসন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য এই কমিটির বার্ষিক বিবরণসমূহ এবং Sharp-কৃত Selections from Government Records vol. 1 দ্রষ্টব্য।

ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল। ৯

ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৭৯১ সালে এটি উঠে যায়। ১৮০৬ সালে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে 'ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা' নামে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০৯ সালের ২রা জানুআরী কোম্পানীর সনদ অনুযায়ী 'ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা' নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল' নামে পরিচিত হয়। এটিই প্রথম প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক। কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'দ্বারকানাথ ঠাকুর,' (সম্বোধি সংস্করণ) পৃঃ, ২৬১ দ্রষ্টব্য।

কার। ১০

পুরো নাম জেমস্ কার। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্। হিন্দু কলেজের সিনিয়র বিভাগের হেডমাস্টার পদে নিযুক্ত হন—১ জুন, ১৮৪১ তারিখে। অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের ভারত-ত্যাগের পর তিনি ১১ এপ্রিল ১৮৪৩ থেকে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-পদ লাভ করেন। কয়েক বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৮৪৮ সনের শেষের দিকে হিন্দু কলেজ থেকে হুগলি কলেজের প্রিনসিপ্যাল হয়ে যান। লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র কার সাহেবের যে বইর নাম করেছেন তার নাম—A Review of Public Instruction in the Bengal Presidency from 1835 to 1851, Parts I and II (London 1853). হিন্দু কলেজের সঙ্গে রামকমলের যোগাযোগের প্রাথমিক সূত্র কারের এই উক্তির মধ্যে পাই: Among the early friends of the Institution may also be mentioned Raja Radhakanta Deb, and Baboos Radhamadub Banerjee, Ramcomul Sen and Russomoy Dutt—(Part II, P. 1.)। এ বিষয়ে সম্পাদকের 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

এগ্রিকাল্চারাল অ্যাণ্ড হর্টিকাল্চারাল সোসাইটি।১০, ৬১

পাদ্রী উইলিআম কেরীর উদ্যোগে ১৮২০, ১৪ই সেপ্টেম্বর এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেরী এর অস্থায়ী সম্পাদক এবং রামকমল সেন দেশীয় সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। বড়লাট মার্কুইস অব হেস্টিংস এই কৃষিসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে উদ্ভিদপ্রীতি তথা কৃষিজ্ঞান সঞ্চারিত করবার উদ্দেশ্যে এই সমাজের পত্তন হয়। ১৮৩৮ সাল থেকে এই সমাজের উদ্যোগে সাময়িক পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হয়। প্রথম সাত বছর সমাজের উদ্যান ছিল টিটাগড়ে। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কৃষিদ্রব্যের বীজ

চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। পরে সমাজ আলিপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষিসমাজের আপিস মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগার ছিল হেয়ার স্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে অবস্থিত মেটকাফ হলে। এই সমাজের সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রুস্তমজী কাওয়াস্‌জী, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

অধিকতর তথ্যের জন্য যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র,' পৃ. ৩৪-৪৩ দ্রষ্টব্য।

ডিরোজিও। ১০

ডিরোজিও-র পুরো নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ডিরোজিও জাতিতে পোর্তুগীজ ছিলেন। ১৮২৬ সনের মে মাসে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি অল্প বয়সেই কবি ও সাংবাদিক রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজী ছিল। প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে ডিরোজিও-র ছাত্ররা সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নীতিবোধ প্রখর বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন সত্য, কিন্তু একথা প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল যে তাঁর ছাত্ররা কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারে না। তিনি ছিলেন বাংলার তরুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের—'ইয়ং বেঙ্গল' নামে যাঁরা পরিচিত হয়েছিলেন—অবিসম্বাদী নেতা। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্রেরা প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেন। এর ফলে সমাজ-নেতৃবর্গ তাঁর উপরে কুপিত হন। এবং হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভা ১৮৩১ সালে তাঁকে অধ্যক্ষপদ থেকে অপসারণ করতে বাধ্য হন।

ডিরোজিও সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গ্রন্থ Life of

Derozio—Thomas Edwards এ ছাড়া যোগেশচন্দ্র বাগলের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', ও 'বাংলার উচ্চশিক্ষা' এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের 'ডেভিড হেয়ার' (সম্বোধি সংস্করণ) দেখা যেতে পারে।

সার্ এডওঅর্ড রায়ান। ১০

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়ে রায়ান এদেশে আসেন। ১৮৩৩-৪৩ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। শেষোক্ত সনে পদত্যাগ করে বিলাত যান। বিচারপতিরূপে এবং শিক্ষা কমিটির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে এদেশবাসীর যথেষ্ট হিতসাধন করেন। বিলাতের সিভিল সার্বিস কমিশনের প্রথমে সদস্য ও পরে সভাপতি পদে বৃত হন।

The Times (London), 25th August, 1875 সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

উইলিঅম কেরী। ১০

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের তিনজন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে অন্যতম। অপর দুইজন—জসুয়া মার্শম্যান ও উইলিঅম ওঅর্ড। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার মূল উদ্দেশ্য হলেও মিশনের প্রতিষ্ঠাতারা বিবিধ উপায়ে এদেশের হিতসাধনে ব্রতী হন। প্রথমাবধি প্রাচ্যভাষা সাহিত্য চর্চায় তৎপর হন ও ক্রমে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কেরী ফোর্ট উইলিঅম কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক পদ লাভ করেন (১৮০১ খ্রীঃ)। বাংলা ছাড়া কেরী ক্রমে মারাঠী ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং কালক্রমে মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হন। এদেশীয় বাংলা ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তায় বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে এর পুষ্টিসাধনে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। মিশনের আনুকূল্যে 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচার দর্পণ' ও ইংরেজী 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (১৮১৭-১৯১৮) প্রকাশিত হয়। উদ্যোক্তা

ও পরামর্শদাতারূপে কেরীর কার্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠাতেও তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী।

প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা ও মিশনের বিবিধ কার্য ব্যতিরেকে ব্যক্তিগতভাবে কেরীর আর একটি বিষয়ের উপর খুবই ঝোঁক ছিল। এটি হলো তাঁর উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা। বিভিন্ন দেশ থেকে নানারকমের গাছপালা আনিয়ে তিনি শ্রীরামপুরে একটি উদ্যান রচনা করেছিলেন। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনের অধ্যক্ষ রক্স বরার সঙ্গে একযোগে তিনি ভারতীয় পুষ্প-সম্পদের উপর চারখণ্ডের এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ আর একটি ব্যাপারের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটি হলো, তৎকর্তৃক 'এগ্রিকালচারাল্ এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া' নামে একটি কৃষিসমাজ স্থাপন। এর কথা স্বতন্ত্রভাবে বলা হয়েছে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য J. C. Marshman-এর Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vols. I & II (1859), সজনীকান্ত দাস রচিত 'উইলিঅম কেরী' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্) ও 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' (২য় সং) দ্রষ্টব্য। সম্প্রতি *Journal of the Asiatic Socicty* (Vol. 1, No. 3, 1959)-তে প্রকাশিত এ, কে. মজুমদারের William Carey and Pandit Vaidyanath প্রবন্ধে মারাঠী সাহিত্যে কেরীর ব্যুৎপত্তি লাভ প্রসঙ্গে কেরীকে বৈদ্যনাথ নামে এক স্বল্পজ্ঞাত মারাঠী পণ্ডিতের সহায়তা দানের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া Roebuck-এর Annals of the College of Fort William এবং A. K. Priolkar-এর The Printing Press in India (Bombay, 1958) থেকেও সাহায্য পাওয়া যাবে।

অ্যালবার্ট হল। ১১

১৮৭৬ সনে এ হলের প্রতিষ্ঠা। প্রিন্স অব ওয়েলসরূপে সপ্তম এড-ওঅর্ড-এর এদেশে আগমন উপলক্ষে এই জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির

উদ্ভব হয়। এর প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহ ও কর্মোদ্যোগ। দেশী-বিদেশী, বিশেষ করে দেশীয় বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের এটি একটি মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট-এর নামানুসারে নামকরণ হয়।

দ্রষ্টব্য: যোগেশচন্দ্র বাগলের 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র', পৃ. ১১০-১৬।

সংস্কৃত কলেজ । ১১

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যেমন প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা ও প্রসার, সংস্কৃত গ্রন্থাদি প্রকাশ, সেইরকম সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যারও পরিবেশন। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই সেকালের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ এর অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত হন। এই কলেজের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারাশংকর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্ক-রত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রী অন্যতম। হোরেস হেম্যান উইলসন, রাজা রাধা-কান্ত দেব, মেজর জি, টি, মার্শাল, রসময় দত্ত, রামকমল সেন প্রভৃতি এর সেক্রেটারি ছিলেন। প্রথম অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কলেজের গত শতকের ইতিবৃত্তের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস'(প্রথম খণ্ড) এবং গোপিকামোহন ভট্টাচার্যের 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড) এবং Kerr-রচিত A Review of Public Instruction, etc. (1853) দ্রষ্টব্য।

হিন্দু কলেজ । ১১

১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী প্রধানত ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষার জন্য

উদ্বুদ্ধ হয়ে কতিপয় ইউরোপীয় প্রধানের সহায়তায় এই প্রসিদ্ধ শিক্ষায়তনটি স্থাপন করেন। প্রথমে এটি একটি স্কুল মাত্র ছিল। কালক্রমে এটির দু'টি ভাগ হয়—জুনিয়র ও সিনিয়র। প্রথমটি স্কুল, দ্বিতীয়টি কলেজ বিভাগে পরিণত হয়। গভর্নমেণ্ট হিন্দু কলেজকে 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কলেজ' নামেও অভিহিত করতেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এড্ওআর্ড হাইড্ ঈস্টএর নাম সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করতে হয়। হিন্দু কলেজ কার্যত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন থেকে 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' (সিনিয়র বিভাগ) ও 'হিন্দু স্কুল' (জুনিয়র বিভাগ) নামে পরিচিত হয়। এই কলেজে ডিরোজিওকে কেন্দ্র ক'রে একদল যুবছাত্র সমাজসেবায় ও দেশের কাজে বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। তাঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ সিকদার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্রষ্টব্য : From Hindu College to Presidency College *by* Jogesh Chandra Bagal, *Hindusthan Standard*, 15th June, 1955 ; A Review of Public Instruction in theBengal Presidency from 1835 to 1851 Pts. I, II. (London, 1853), *by* Kerr ; এবং Presidency College Register (1927). এ ছাড়া শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের—'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র', পৃ. ২৬-৩৩ (১৯৫৯), 'বাংলার উচ্চশিক্ষা', পৃ. ৫-৭ ; এবং Hindu College, *Modern Review*, July, September, December, 1955.

ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি । ১১, ৬১

দরিদ্রদের স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দেওয়াই এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী টার্নারের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে এই সোসাইটি দুঃস্থ ও নিঃসহায় ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেশীদের

সাহায্য দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে দুঃস্থ ভারতবাসীদেরও সাহায্য দানের ব্যবস্থা হল। ১৮৩৩ সনে সোসাইটি পুনর্গঠিত হয় ও গণ্যমান্য ভারতীয়েরা এর সভ্য নিযুক্ত হন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রুস্তমজী কাওয়াসজী, রামকমল সেন প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', পৃ. ১৪-১৫, ৫৩-৫৬ দ্রষ্টব্য। প্যারীচাঁদ মিত্রের Early History of District Charitable Society, *National Magazine*, March, 1908 প্রবন্ধটিও এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জে. সি. মার্শম্যান। ১২

পুরো নাম জন ক্লার্ক মার্শ'ম্যান। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জোশুয়া মার্শম্যানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাল্যকাল থেকেই বাংলাদেশে অবস্থান করেন, ফলত বাংলা ভাষা তিনি অতি সহজেই অধিগত করেন। সংস্কৃত ও চীনা ভাষাতেও তিনি ব্যুৎপন্ন হন। ১৮১৮ সনে মিশনের আনুকূল্যে ও তত্ত্বাবধানে তিনখানি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়—মাসিক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' (এপ্রিল) সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' (২৩ মে) এবং ইংরাজী 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (প্রথমে মাসিক, মধ্যে ত্রৈমাসিক, কিছুকাল বন্ধ থাকার পর সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়)। এ তিনখানিরই সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

মার্শম্যান ১৮৪০ সালের জুলাই থেকে বাংলা গবর্নমেন্ট গেজেট বা রাজকীয় বার্তাবহ সম্পাদনা শুরু করেন। ১৮৫২ সনে নবেম্বর নাগাদ পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এখানির সম্পাদনার ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। ইংল্যাণ্ড অবস্থান কালেও মার্শম্যান ভারত সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় রত ছিলেন। তৎপ্রণীত

গ্রন্থাবলীর মধ্যে The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, vols. I & II (1859) সমধিক প্রসিদ্ধ।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : John Clark Marshman, *The Times* (London), 10th July, 1877 ; সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' (২য় সং)।

মেডিক্যাল কলেজ । ১২

১৮৩৫ সনের ১লা জুন থেকে মেডিক্যাল কলেজের কাজ শুরু হয়। প্রথম অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রামলি। ১৮৩৬, ৩১শে মার্চ থেকে শিক্ষাদান কার্য শুরু হয়। প্রথম শবব্যবচ্ছেদ হয় ১৮৩৬ সনের ২৮শে অক্টোবর তারিখে। কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৩ সনে তৎকালীন চিকিৎসাব্যবস্থার অনুসন্ধান ও তার উন্নতি-বিষয়ে মতামত প্রকাশের জন্য যে পাঁচজন বিশিষ্ট সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন করেন রামকমল সেন ছিলেন তার একমাত্র ভারতীয় সদস্য। ঐ কমিটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রভৃতি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলেজে প্রথম উপাধি-পরীক্ষা শুরু হয় ১৮৩৮, ৩০শে অক্টোবর।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য Kerr-এর A Review of Public Instruction etc., Centenary Volume of the Calcutta Medical College এবং যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র', পৃ. ৮৩-৯০ ও Early Years of the Calcutta Medical College, *Modern Review*, 1947, September, October সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

জোন্স্ । ১৮

স্যার উইলিঅম জোন্স খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও বিচারপতি। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম। ছাত্রাবস্থায় ভারতবিদ্যার প্রতি তিনি

আকৃষ্ট হন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'রয়েল সোসাইটি'র ফেলো মনোনীত হন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়ে ভারতে আসেন ও বহু পরিশ্রমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর প্রধান কীর্তি ১৭৮৪ সনে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে মনুসংহিতা, শকুন্তলা. গীতগোবিন্দ প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সরকারী নির্দেশে তিনি হিন্দু ও মুসলমান আইনের সার-সংকলন করেন। ১৭৯৫ সালে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বিশদ বিবরণের জন্য Arberry রচিত The Asiatic Jones, Lord Teignmouth-এর Memoirs of the life, writings and correspondence of Sir William Jones (1806), এবং Bi-Centenary Volume of Sir William Jones দ্রষ্টব্য।

ফিভার হস্‌পিটাল কমিটি। ২৪

কলকাতায় জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হেতু হাজার হাজার লোক মারা যায়। ধর্মতলা নেটিভ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ শহরের কেন্দ্রস্থলে সাধারণগম্য একটি হাসপাতাল স্থাপনে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে উদ্যোগী হন। উদ্দেশ্য, প্রধানত জ্বররোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এজন্য দেশীয় ও ইউরোপীয় কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। সরকার পরের বছর এই কমিটির কার্যক্রম অনুমোদন করেন। এবং এর উপর শহরের সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা, কর-নির্ধারণ প্রভৃতিরও ভার দেন। এই কমিটি 'ফিভার হসপিট্যাল কমিটি' নামে আখ্যাত হয়। এর কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে বর্তমান পৌর-সভার প্রতিষ্ঠা। হাসপাতাল নির্মাণের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হয় তার দ্বারা মেডিক্যাল কলেজ জেনারেল হাসপাতাল স্থাপনের অনেকটা সুরাহা হয়েছিল।

দ্রষ্টব্য : Henry Cotton রচিত Calcutta Old and New এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', (২য় সং)।

দ্বারকানাথ ঠাকুর। ২৫

উনবিংশ শতকে যে কয়েকজন মনীষীর অক্লান্ত কর্মতৎপরতায় বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়েছিল দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁদের অন্যতম। দেশের হিতকামনায় তাঁর দান অতুলনীয়। ১৮২৩ সনে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে তিনি রামমোহন রায়ের সঙ্গে আন্দোলন শুরু করেন। হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের উৎকর্ষ সাধনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। দ্বারকানাথ সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণের জন্য কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'দ্বারকানাথ ঠাকুর' (সম্বোধি সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

মতিলাল শীল। ৪৫

সেকালের ধনকুবের, কলকাতার রথস্‌চাইল্ড বলে খ্যাত মতিলাল শীল। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে স্বীয় প্রতিভাবলে প্রচুর ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর দান অপরিমেয়। কলকাতার 'শীলস্‌ ফ্রি কলেজ' নামক অবৈতনিক বিদ্যালয় তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় (১ মার্চ, ১৮৪৩)। এর জন্য তিন লক্ষ টাকার একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। অন্যান্য সৎ কর্মেও তাঁর প্রচুর দান ছিল।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ ১৪৭-৭৫১)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র'—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

আশুতোষ দেব। ৪৯

আশুতোষ দেব, ছাতুবাবু নামেই যাঁর প্রসিদ্ধি, তৎকালীন কলকাতার বিখ্যাত ধনী রামদুলাল দেব (সরকার) পুত্র। ইনি ১২১০

বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষের চেষ্টায় সংস্কৃত শকুন্তলা নাটক বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়। তিনি সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর দানশীলতা সকলের আদর্শ-স্থানীয় ছিল। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে উপযুক্ত পণ্ডিতদের দ্বারা অনেক সংস্কৃত পৌরাণিক গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ করান। ১২৬২ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফেলিক্স কেরী। ৫১

ডঃ উইলিয়াম কেরীর পুত্র। ১৭৮৬, ২০শে অক্টোবর ইংলণ্ডে জন্ম। মাত্র সাত বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে বাংলাদেশে আসেন। পরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকরূপে ব্রহ্মদেশে গমন করেন। শ্রীরামপুরে ওঅর্ড-এর ছাপাখানায় সহকারীর কাজও করেন। ভাষাশিক্ষাই তাঁর আদর্শ ছিল। বাংলা ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন। রামকমল সেনের প্রসিদ্ধ বৃহৎ ইংরেজি-বাংলা অভিধানটি ফেলিক্স কেরী ও রামকমল উভয়ে সম্পাদন ও সংকলন করবেন স্থির হয়েছিল। কিন্তু ফেলিক্স-এর মৃত্যুর জন্য তা সম্ভব হয়নি। পরে রামকমল সেন একাই ১৮৩৪ সনে অভিধানটির কার্য সম্পন্ন করেন। ১৮২২, ১০ই নভেম্বর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। ফেলিক্সের প্রধান কীর্তি—'বিদ্যাহারাবলী', (বাংলা ভাষায় সুবৃহৎ কোষগ্রন্থ)। ফেলিক্স-রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: 'ব্রিটিনদেশীয় বিবরণসঞ্চয়', Pilgrim's Progress-এর বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: 'ফেলিক্স কেরী' (সাহিত্যসাধক চরিত-মালা, গ্রন্থসংখ্যা ৮৮)।

বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি বা জমিদারসমাজ। ৬১

ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়মানুগভাবে আলোচনার জন্য এই সমাজের প্রতিষ্ঠা (মার্চ, ১৮৩৮)। তখন সরকার নিষ্কর সম্পত্তি

বাজেয়াপ্তকরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় এর প্রতিবাদ ও কথঞ্চিৎ প্রতিরোধ কল্পে যে সংঘবদ্ধ প্রযত্ন আবশ্যক তা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করেন। রামকমল সেন এই উদ্দেশ্যে তৎকালীন Bengal Chamber of Commerce এর মত একটি সমাজ বা সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন ১৮৩৭, অক্টোবর নাগাদ। এই প্রস্তাবের সূত্র ধরেই কয়েক মাস আলাপ-আলোচনা ও উদ্যোগ আয়োজনের পর জমিদারসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে শুধু ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ই নয়, কৃষি শিল্প শিক্ষা বিচার, শাসন প্রভৃতি নানা ধরনের বিষয় সমাজের আলোচনার অন্তীভূত হয়। জমিদার বা সমাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রধানেরা সম্মিলিতভাবে কাজ করতেন। কর্মকর্তৃসভায় ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয়েই স্থান লাভ করেন। সম্পাদক হন প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং 'ইংলিশম্যানের' সম্পাদক উইলিঅম কব হারী। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন রাজা রাধাকান্ত দেব।

দ্রষ্টব্য: 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', দ্বিতীয় খণ্ড, (তৃতীয় সংস্করণ) পৃ, ৪০৫-৮, ৭৫২, এবং রামগোপাল সান্যালের Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India, Part II. যোগেশচন্দ্র বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'-ও দেখা যেতে পারে।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। ৬১

'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'ভারতবর্ষীয় সভা'-র প্রতিষ্ঠাকাল ২০ এপ্রিল ১৮৪৩। মুখ্যত হিন্দু কলেজে শিক্ষিত নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ জর্জ টমসনের উপদেশে এই সভার প্রতিষ্ঠাকার্যে অগ্রণী হন। এর আগে ভারত-কথা আলোচনা ও প্রচারের জন্য বিলাতে ভারত-হিতৈষী ইংরেজগণ মিলিত হয়ে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করেন (জুলাই, ১৮৩৯)। জর্জ টমসন এই সোসাইটির একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। দ্বারকানাথ

ঠাকুর ১৮৪৩ সালের শেষ দিকে তাঁকে এদেশে নিয়ে আসেন এবং স্বদেশভক্ত যুব-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। কিছু কাল আলাপ আলোচনার পর বিলাতের সোসাইটির আদেশে স্থানীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের কল্যাণমূলক যাবতীয় কার্য পরিচালনার ভার এই সভা গ্রহণ করেন। বিলাতের সোসাইটিকে ভারতীয় বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ঠিক ঠিক তথ্য পরিবেশনও এই সভার অন্যতম কার্য বলে গণ্য হয়। প্রথম সভাপতি জর্জ টমসন এবং সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। লক্ষণীয় যে, স্থানীয় ইউরোপীয় সমাজের সহায়তা ব্যতিরেকেই এটি স্থাপিত।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (৩য় ভাগ) এবং বিমানবিহারী মজুমদারের History of Political thought from Rammohon to Dayananda (1934) এবং যোগেশচন্দ্র বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' দ্রষ্টব্য।

বেথুন সোসাইটি। ৬১

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নামে এই সভা ১৮৫১, ১১ই ডিসেম্বর তারিখে স্থাপিত হয়। সভাস্থাপনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ইউরোপীয় ও ভারতীয় গুণীজ্ঞানী নেতৃবৃন্দ। ভারতবাসীর দ্বারা ভারতবর্ষে যাবতীয় কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনার একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র রূপে এর আবির্ভাব। ইউরোপীয়েরাও এখানকার সকল বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে একযোগে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পান। সেযুগে যখন ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে সেই সময় এই সভা উভয়ের মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং উক্ত সংঘাতজনিত কুফল খানিকটাও বিদূরণে সমর্থ হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে সমসাময়িক রাজনীতি ও ধর্ম-বহির্ভূত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির কোনো না কোনো বিষয়ের

উপর সদস্যেরা সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করতেন। একাধিক শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় এখানকার প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনার ফলে। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই সভা জীবিত থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। সোসাইটির প্রথম সভাপতি ডাঃ ফ্রেডারিক জে. মৌঅট ও সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র।

অধিক তথ্যের জন্য যোগেশচন্দ্র বাগলের 'বেথুন সোসাইটী' দ্রষ্টব্য।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন । ৬১

সাধারণের নিকট 'ভারতবর্ষীয় সভা' নামে পরিচিত। প্রতিষ্ঠাকাল ২৯ অক্টোবর ১৮৫১। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে প্রথম সুষ্ঠু নিয়মানুগ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের ঔদ্ধত্য এবং সরকার কর্তৃক অনুসৃত ভারতবাসীর প্রতিকূল বিধি-ব্যবস্থা এইরূপ একটি সংঘ স্থাপনে ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করে। প্রতিষ্ঠানটির দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—প্রথম, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সমাজের-নেতৃবর্গ উক্ত উদ্দেশ্যে এখানে সম্মিলিত হন; দ্বিতীয়, এ প্রতিষ্ঠানে সরকারী কি বেসরকারী স্থানীয় কোনো ইউরোপীয়ের আদৌ সংশ্রব ছিল না। শাসন ব্যবস্থায় এদেশীয়দের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা সিভিল সার্ভিস আইন আদালত, প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষা স্বাস্থ্য পৌর-সংস্কার এবং এই ধরনের যাবতীয় সমাজ-কল্যাণকর কার্যের নিমিত্ত এইসভা দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা, পর্যালোচনা ও আন্দোলন পরিচালনা করেন। সভার সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি) ও সহকারী সম্পাদক দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা)। গত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে 'ভারতবর্ষীয় সভা' ছিল ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: Life of Raja Digambar

Mitter—Bholanath Chunder ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যোগেশচন্দ্র বাগল : History of Political thought from Rammohan to Dayananda—Bimanbehari Mazumdar ; 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' —যোগেশচন্দ্র বাগল ; 'ভারতবর্ষীয় সভা' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৬২-আষাঢ় ১৩৬৩)—যোগেশচন্দ্র বাগল।

হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্‌টিটিউশন বা হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়। ৬২

সেকালের হিন্দু সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে স্থাপিত প্রথম অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠাকাল ১লা মার্চ ১৮৪৬। মিশনারীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে খৃষ্টতত্ত্ব শেখান আবশ্যিক ছিল। উদ্দেশ্য, অল্পবয়স্ক কোমলমতি হিন্দু ছাত্রদের মনে খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মান। মিশনারীদের প্ররোচনায় ছাত্রদের কেউ কেউ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এই বিষয়টি নিয়ে হিন্দুসমাজের মধ্যে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্রাহ্মসমাজের পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেও মিশনারীদের অপকৌশলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। নিঃসম্বল ও অল্পবিত্ত হিন্দু ছেলেদের জন্য একটি অবৈতনিক উপবিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যে এই আন্দোলনের পরিণতি ঘটে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভার সভাপতি হন রাধাকান্ত দেব এবং সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন সেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এর প্রথম পরিদর্শক হলেন রাজনারায়ণ বসু।

বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' (বিশ্বভারতী—৪র্থ সং)। এবং যোগেশচন্দ্র বাগলের 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) ও 'বাঙলার জনশিক্ষা'

(বিশ্বভারতী)। এ ছাড়া *Bengal Past and Present*—July-December 1962-তে প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র বাগলের Primary Education in Calcutta (1818-1833) প্রবন্ধটিও দেখা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট ঃ সংযোজন

রামকমল সেন সম্বন্ধে আরও তথ্য

রামকমল সেন সম্বন্ধে আরও তথ্য

হিন্দু কলেজ : হিন্দু কলেজ ১৮১৭, ২০শে জানুয়ারী স্থাপিত হয়। রামকমল কলেজের অন্যতম প্রাথমিক চাঁদাদাতা সভ্য ছিলেন। তবে এর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। কলেজের দেশীয় সম্পাদক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় রামকমলকে অধ্যক্ষ-সভায় গ্রহণের নিমিত্ত ১৫ই জুলাই ১৮২১ তারিখে অধ্যক্ষদের একখানি পত্র লেখেন। প্রয়োজনীয় অংশ এই : I further take the liberty of suggesting that it would be very desirable and add greatly to the interest of the Institution if any of the Managers would frequently visit and superintend the duty of the school, but as I am well aware gentlemen that none of you can spare sufficient time for that purpose, I think that it would be a good plan to appoint an additional Manager who would attend particularly to that duty and as Baboo Ramcomul Sen who is already a subscriber is very competent for that purpose, I beg leave to propose him to fill the situation of superintending Manager." (MSS., *Proceedings of the Hindoo College Managing Committee*, unpublished).

পত্রোক্ত প্রস্তাবে অধ্যক্ষগণ সম্মত হ'লে রামকমল ১৮২১, জুলাই মাস থেকেই পরিদর্শক-অধ্যক্ষ পদে বৃত-হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৮৪৪) রামকমল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রামকমল কলেজের উন্নতিমূলক যাবতীয় কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ সনে সরকারী আদেশবলে অধ্যক্ষগণ 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন্' বা শিক্ষা কমিটির সম্মানিত সদস্য গণ্য হন এবং তাঁদের ভিতর থেকে উক্ত কমিটিতে প্রতি বৎসর দুজন ক'রে

কর্মী-সদস্য হবার অধিকার লাভ করেন। রামকমল ১৮৩৭, ১৮৪০-৪১ এই দুই সনে কমিটির সদস্যরূপে অধ্যক্ষসভা কর্তৃক প্রেরিত হ'ন।

শিক্ষার বাহন ইংরাজী ধার্য হ'লে ছাত্রগণের বাংলা শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য হিন্দু কলেজ সংলগ্ন একটি বাংলা পাঠশালা স্থাপিত হয় ১৮৪০ সনে। এখানে শিক্ষণীয় বিবিধ বিষয় বাংলার মাধ্যমেই ছাত্রদের শেখাবার ব্যবস্থা হ'য়। পাঠশালাটি হিন্দু কলেজ পাঠশালা নামেও আখ্যাত হ'তে থাকে। পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় রামকমলের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল।

এশিয়াটিক সোসাইটি : এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি ডাঃ উইলসন (১৮১১-৩৩) রামকমলের গুণপনা ও কর্মকুশলতায় মুগ্ধ ছিলেন। তিনি রামকমলকে সোসাইটির বৈতনিক কর্মীরূপে গ্রহণ করেন। রামকমল ১৮২৯, মার্চ নাগাদ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ আরও চারজন এই সময়ে সদস্য হন। সোসাইটিতে তাঁরাই প্রথম ভারতীয় সদস্য।

"এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি" বা কৃষিসমাজ : 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি' বা কৃষিসমাজের সঙ্গেও প্রায় প্রতিষ্ঠাবধি রামকমলের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রথমে বৈতনিক কর্মীরূপে এবং পরে দায়িত্বপূর্ণ সদস্যপদে রামকমল এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় রত হন। মৃত্যুকালে তিনি এর সহকারী সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। এই সমাজের 'ট্রান্‌জ্যাকশন্‌স' বা প্রবন্ধপুস্তকে কাগজ-শিল্পের উপর রামকমলের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

গৌড়ীয়সমাজ : রামকমল গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রগণ্যদের মধ্যে একজন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে স্বদেশবাসীদের জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণের সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে এই সমাজ ১৮২৩, ১৬ই ফেব্রুয়ারী স্থাপিত হয়।

এ দিনকার সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকমল স্বয়ং। ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন নবীন ও প্রবীণ এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ সভায় যোগদান করেন। পরবর্তী অধিবেশনে, ২৩ মার্চ তারিখে সমাজের কার্য সুপরিচালনার জন্য বিশিষ্ট গুণী মানী ও সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি অধ্যক্ষসভা গঠিত হয়। সমাজের সম্পাদক হলেন রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

সেভিংস ব্যাঙ্ক: গবর্নমেণ্ট ১৮৩৩, ১৩ এপ্রিল তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেটে' একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক বা সঞ্চয়-ভাণ্ডার স্থাপনের সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন। নিয়মপত্র রচনার জন্য সাত জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হল। এ কমিটিতে রামকমল সেন ছিলেন একমাত্র ভারতীয় সদস্য। কমিটি কর্তৃক নিয়মপত্র রচনা ও সরকার দ্বারা অনুমোদনের পর পরবর্তী ১২ই অক্টোবর 'ক্যালকাটা গেজেটে' এটি প্রচারিত হল। সরকার ১৪ জন সদস্যের একটি কমিটির উপর ব্যাঙ্ক পরিচালনার ভার দেন। এই কমিটিতে রামকমল সেন সহ ভারতীয় ছিলেন পাঁচজন। ১ নভেম্বর, ১৮৩৩ তারিখে সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হল। সঞ্চয় ভাণ্ডারের কার্যারম্ভে রামকমলের উৎসাহ ও তৎপরতা লক্ষণীয়। প্রথম দিনের কথা সংবাদপত্রে অংশতঃ এভাবে প্রকাশিত হয়:

......Many deposits of Rs. 5 and 10 were received from the native writers in the Bank of Bengal ; Baboo Ramcomul Sen, the Khazanchee of that establishment having exerted himself to explain to the assistants the nature of the benefits which the savings Bank can afford. (*The Asiatic Journal* vol. XIII. 1834 ; *Asiatic Intelligence,* Calcutta, April, pp 244-5).

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ: কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে রামকমল সেন বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৮৩৩ সালে বড়লাট উইলিঅম বেন্টিঙ্ক তৎকালীন চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ এবং উন্নততর ব্যবস্থা সুপারিশ করার জন্য পাঁচ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে ছিলেন—ডাঃ জন, গ্রাণ্ট, জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড, সি. ই. ট্রেভেলিয়ান, ডাঃ মণ্টফোর্ড জেম্‌স ব্রাম্‌লি এবং রামকমল সেন। তখন এদেশীয়দের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা-দানের সরকার-পরিচালিত তিনটি প্রতিষ্ঠান ছিল, যথা—'স্কুল ফর নেটিভ ডক্টরস', কলিকাতা মাদ্রাসার বৈদ্যক শ্রেণী এবং সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণী। কমিটি বিশেষ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর ১৮৩৪, ২০শে অক্টোবর তাঁদের সুপারিশ বড়লাটের নিকট পেশ করেন। কমিটি প্রচলিত শিক্ষাক্ষেত্রগুলি তুলে দিয়ে সরকার কর্তৃক একটি বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা আবশ্যক মনে করেন। বড়লাট বেন্টিঙ্ক এই সুপারিশ পুরাপুরি গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৫, ২৮শে জানুআরী একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তী ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে এই উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিক কার্যাদি সুরু হলো। ১৮৩৫, ১লা জুন কলেজের কার্যারম্ভ হয়।

রামকমল বরাবর মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যোগরক্ষা করেছিলেন। কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক, শিবপুর বোটানিক গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ নাথানিয়েল ওয়ালিক ১৮৪৩ সনে ছুটি নিয়ে বিলাত যান। রামকমল ভারতীয় উদ্ভিদের গবেষণায় ওয়ালিকের কৃতিত্বে বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজে উদ্ভিদবিদ্যায় সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে পর পর তিন বৎসর একটি স্বর্ণপদক দেবার ব্যবস্থা করেন। এন. ওয়ালিকের নামে এই পদকের নামকরণ হয়।

সংস্কৃত কলেজ : প্রতিষ্ঠা অবধি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে রামকমল সেনের সংযোগ বিদ্যমান ছিল। কলেজের বিবিধ কাজে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতার কথার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন

সময়ে। কলেজের সেক্রেটারী এ. ট্রয়ার ১৮৩৫ সনের ৩১ জানুআরি একটি বিবরণে রামকমল সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন :

I cannot terminate this article without mentioning the name of Baboo Ramcomul Sen, one of the Managers of the Hindu College, who, animated with the noble desire of being useful to his countrymen, shunned no trouble and spared no time to afford me his disinterested assistance, not only in the Selection of the boys to be admitted and of those most recommedable for Scholarships in consideration of their private circumustances, but also in Superintending the Sanscrit College library, procuring valuable manuscripts, conducting the interior economy of the College, and tendering me his advice for keeping the discipline, and promoting the general success of the institution,—*Selections from the Educational Records*, Part. 1, *By* H. Sharp, P. 44.

সেক্রেটারী ট্রয়ারের পদত্যাগের দিন ১৮৩৫, ২৬ ফেব্রুআরি থেকে সংস্কৃত কলেজের উক্ত পদে রামকমল অস্থায়ীভাবে কাজ করতে থাকেন। পরবর্তী ১১ জুন মাসিক একশত টাকা বেতনে তিনি কলেজের সেক্রেটারী ও সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। ১৮৩৯, ১ জানুয়ারি তিনি এই পদ ত্যাগ করেন।

জমিদার সভা : সেযুগের এই বিখ্যাত সভাটির পরিকল্পনা যে রামকমল সেনের, একটি সংবাদ পাঠে তা অবগত হওয়া যায়। 'সমাচার দর্পণ' ১৪ অক্টোবর ১৮৩৭ তারিখে লেখেন : "নূতন সমাজ। কথিত আছে যে দেওয়ান শ্রীযুত রামকমল সেন এক নূতন সমাজ স্থাপন করিতে

নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে নিষ্কর ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে এবং রাজকীয় কর্মে বঙ্গভাষা চলন-হওয়া বিষয়ে এক আবেদন পত্র ইংলণ্ড দেশে প্রেরণ করেন।" এই নিমিত্ত ১২ নভেম্বর ১৮৩৭ একটি সাধারণ সভা হয়। প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য ও নিয়মপত্র রচনার ভার একটি অস্থায়ী কমিটির উপর অর্পিত হয়। কমিটিতে ছিলেন—রাজা রাধাকান্ত দেব, দেওয়ান রামকমল সেন, ভবানীচরণ মিত্র এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ১৮৩৮ সনে ২১ মার্চ এক সাধারণ সভায় উদ্দেশ্য ও নিয়মপত্র গৃহীত হয়ে 'জমিদার সভা' স্থাপিত হয়। সভার কার্য নির্বাহার্থ একটি পরিচালক-সমিতি গঠিত হয়। এই কমিটিতে অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন রামকমল সেন।

সাহিত্য-সেবা : রামকমল বাংলা সাহিত্যের চর্চায় বিশেষভাবে মন দেন। তাঁর 'ঔষধ সারসংগ্রহ' অথবা 'সচারচর ব্যবহৃত ঔষধ নির্ণয় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম চিকিৎসা-গ্রন্থ। 'স্কুল বুক সোসাইটি'র পক্ষে রাধাকান্ত দেব এবং তারিণীচরণ মিত্রের সহযোগে তিনি ১৩১টি কাহিনী সম্বলিত 'নীতি-কথা ১ম ভাগ' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। রামকমলের তৃতীয় গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' (১৮২০)। শ্রীরামপুর মিশনের কোন কোন কর্মীর সঙ্গে একযোগে এখানি তিনি সংকলন করেন। রামকমলের সর্বপ্রধান সাহিত্যকীর্তি 'ইংরেজী-বাংলা অভিধান' সংকলন। এখানি জনসনের ইংরেজী অভিধানের বঙ্গানুবাদ। দুইখণ্ডের এই বিরাট গ্রন্থ ১৮৩৪ সনে সমাপ্ত হয়।

এই সকল তথ্য এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিশদ উল্লেখ শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগলের 'রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়' (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), "বাংলার নব্য সংস্কৃতি' (বিশ্বভারতী), 'গৌড়ীয় সমাজ', সাহিত্যপরিষদ-পত্রিকা, ৬০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 'সেভিংস ব্যাঙ্কের গোড়ার কথা' প্রবাসী, পৌষ ১৩৬১ প্রভৃতিতে পাওয়া যাবে।

বংশলতিকা

বিজয়কৃষ্ণ সেন- কৃত গরিফা ও কলকাতার সেনপরিবারের বংশতালিকার উপর নির্ভর ক'রে বর্তমান বংশলতিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্তের সাহায্য স্মরণীয়। —কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

গোকুলচন্দ্র হালিশহরের নারায়ণ রায়ের কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। গোকুলচন্দ্রের ষষ্ঠ পুত্র রামনিধি হরিনারায়ণ গুপ্তের কন্যা ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভগ্নী জগদম্বাকে বিবাহ করেন। রামকমলের পুত্র প্যারীমোহন, প্যারীমোহনের দ্বিতীয় পুত্রই স্বনামধন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। রামকমলের প্রথম পুত্র হরিমোহনের চতুর্থ পুত্র রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর সম্পাদকরূপে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
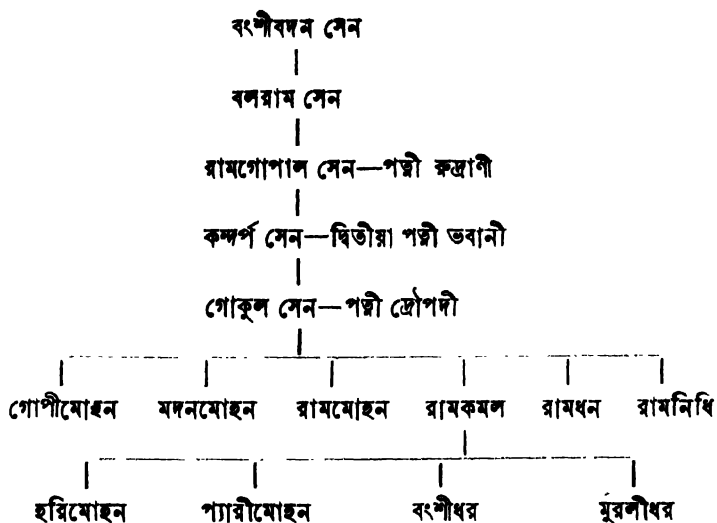
সংশোধন

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধপাঠ
১	১৬-১৭	'মনু ও কোলব্রুক'-এর পরিবর্তে 'মনু-কোলব্রুক'।
৮	৪	'১৮১৮ হইতে'-র পরিবর্তে '১৮১৮ থেকে'।
৬৫	৪	'নো টা রি রিপাবলিক'-এর পরিবর্তে 'নোটারি পাবলিক'।
৭৮	১	'লেখমালায়'-এর পরিবর্তে 'লেখতে'।
৭৯	১৭	'উল্লেখ পাওয়া যায়'-র পরিবর্তে 'উল্লেখ পাওয়া যায় না'।
৮৯	২০	'১৮৩'-র পরিবর্তে ১৮৩৬।

ঘটনাপঞ্জী

বন্ধনীমধ্যস্থ সংখ্যা বর্তমান পুস্তকের পৃষ্ঠাঙ্কনির্দেশক। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'রামকমল সেন' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত) এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' প্রাসঙ্গিক গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৭৮৩	১৫ মার্চ রামকমল সেনের জন্ম ('রামকমল সেন' ৫)।
১৭৮৪	১৫ জানুআরী এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা (৯০)।
১৭৯৯-১৮০০	কলিকাতায় আগমন ও ইংরেজী শিক্ষা (৭)।
১৮০০	ফোর্ট উইলিঅম কলেজ প্রতিষ্ঠা (৫,৮৬)।
১৮০০-০৩	চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নামির অধীনে চাকুরী (৭)।
১৮০৩	১০ ডিসেম্বর বিবাহ (৭)।
১৮০৪	ডাঃ উইলিয়ম হাণ্টারের প্রেসে কম্পোজিটর নিযুক্ত (৯,৪৯)।
১৮০৮	কোম্পানীর চিকিৎসকরূপে ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসনের কলিকাতায় আগমন (৮৯)।
১৮১০	ডাঃ উইলসন ও মিঃ লেডেন হিন্দুস্থানী প্রেসের অংশীদার (৫৩)।
১৮১১	হাণ্টার ও লেডেনের যবদ্বীপ যাত্রা। উইলসন কর্তৃক প্রেসের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ। ম্যানেজার পদে রামকমল সেন (৫৩, ৫৪)।
১৮১১-৩৩	ডাঃ উইলসন বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী (৮৯)।
?	অবসর সময়ে রামকমল এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মে লিপ্ত। কালক্রমে নেটিভ সেক্রেটারীর পদ লাভ (৮)।
১৮১৬	ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপন (৯,১০,১১)
১৮১৭	২০ জানুআরী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। রামকমল সেন অন্যতম চাঁদাদাতা সদস্য (৯,৯৭,১১১-১২)।

১৮১৯ ১ সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা (৫০,৯০,৯১)। "নীতিকথা প্রথম ভাগ" ('রামকমল সেন' ২৫-২৬)।

১৮১৯ "ঔষধসার সংগ্রহ" (ঐ ১৫, ২৫)।

১৮২০ "হিতোপদেশ" নীতিকথা তৃতীয় ভাগ নামে প্রকাশিত (ঐ ২৬)।

১৮২০ ১৪ সেপ্টেম্বর এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। ডাঃ উইলিয়ম কেরী অস্থায়ী সম্পাদক। রামকমল সেন দেশীয় সম্পাদক। রামকমল পরে এর অন্যতম সহ-সভাপতি হন (১০, ১১, ৯৩, ৯৪, ১১২)।

১৮২১ জুলাই হিন্দু কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ (১১১)।

১৮২৩ ১৬ ফেব্রুআরী গৌড়ীয় সমাজ স্থাপন। রামকমল সেন অন্যতম সম্পাদক (১১২-১৩)।

১৮২৪ ১ জানুআরী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাবধি রামকমল কলেজের হিসাবরক্ষক ('সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, ৭)।

১৮২৮ টাকশালের দেওয়ানের পদলাভ (৯, ৫৪)।

১৮২৯ এশিয়াটিক সোসাইটির মেম্বর বা সদস্য (১১২)।

১৮৩০ ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। ১৮৩৩ সনে নেটিভ কমিটি গঠিত। রামকমল সেন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সম্পাদক (১১)।

১৮৩২ ১৪ নবেম্বর ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের দেওয়ান (৯)।

১৮৩৩ ১৩ এপ্রিল গবর্নমেণ্ট কর্তৃক সেভিংস ব্যাঙ্ক বা সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপনের ঘোষণা। রামকমল সেন নিয়মপত্র রচনা কমিটির অন্যতম সদস্য (১১৩)।

১২ অক্টোবর সরকার কর্তৃক নিয়মপত্র গ্রহণ এবং ১৪ জন সদস্যের একটি কমিটির উপর সঞ্চয় ভাণ্ডারের পরিচালনার ভার অর্পণ। পাঁচজন ভারতীয় সদস্যের মধ্যে রামকমল একজন। ১ নবেম্বর সঞ্চয় ভাণ্ডারের কার্যারম্ভ (১১৩)।

সুষ্ঠুরূপে এ দেশীয়দের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের উপায়াদি নির্ধারণের জন্য বড়লাট বেন্টিঙ্ক কর্তৃক পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত কমিটিতে রামকমল অন্যতম সদস্য (১১৪)।

১৮৩৪	অক্টোবর কমিটি কর্তৃক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ (১২)।
১৮৩৪	দু খণ্ডে ইংরেজী-বাংলা অভিধান প্রণয়ন (১২, ১১৬)
১৮৩৫	জাষ্টিস্ অব দি পীস্ ('রামকমল সেন' ২২)।
১৮৩৫	২৮ জানুআরী বড়লাট বেন্টিঙ্ক কর্তৃক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা (১১৪)।
	২৬ ফেব্রুআরী রামকমল সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটারী (১১৫, 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, ৪৪)।
	১ জুন মেডিকেল কলেজের কার্যারম্ভ (১১৪)।
	১১ জুন সংস্কৃত কলেজের স্থায়ী সেক্রেটারী (১১, ১১৫; 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, ৪৪)।
১৮৩৭	অক্টোবর রামকমল সেন কর্তৃক জমিদার সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব (১১৫)। ১২ নবেম্বর সভা স্থাপন উদ্দেশ্যে প্রথম সাধারণ সভা। রামকমল অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলী রচনার জন্য গঠিত কমিটির অন্যতম সদস্য (১১৬)।
১৮৩৮	২: মার্চ জমিদারসভা প্রতিষ্ঠা। রামকমল অধ্যক্ষসভার সদস্য (১১৬)।
১৮৩৯	১ জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী-পদ ত্যাগ (১১৫; 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, ৪৪)।
১৮৩৯	পেরেন্ট্যাল একাডেমির অন্যতম অধ্যক্ষ (১১)।
১৮৪১	২ অগস্ট মৃত্যু (৪৪)।

নির্ঘণ্ট

ইংল্যাণ্ড, কলকাতা প্রভৃতি সুপরিচিত নামগুলি (যেখানে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত) সম্পাদকের নাম এবং 'ভূমিকা' 'লেখকপ্রসঙ্গে' 'ঘটনাপঞ্জী' ইত্যাদি অংশভুক্ত শব্দগুলি নির্ঘণ্টে দেওয়া হয়নি।